الملك لله

অর্থ অনর্থের মূল নয়

ওসমান নূরী তপবাস

এরকাম প্রকাশনী

ইস্তাম্বুল: ২০২০ খ্রি./১৪৪১ হি.

© এরকাম প্রকাশনী -ইস্তাম্বুল: ২০২০ খ্রি./১৪৪১ হি.

অর্থ অনর্থের মূল নয়

ওসমান নূরী তপবাস

মূল বইয়ের নাম: Müslümanın Para ile İmtihanı
লেখক: ওসমান নূরী তপবাস
আনুবাদক: আহমাদ আমিন
প্রচ্ছদ: রাসিম শাকির ওলু
প্রকাশনায়: এরকাম প্রকাশনী
ISBN: 978-605-302-748-5
ঠিকানা: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Mahallesi, Atatürk Bulvarı,
Haseyad 1. Kısım No:60/3-C
Başakşehir, İstanbul, Turkey
টেলেফোন: (+90-212) 671-0700 pbx
ফ্যাক্স: (+90-212) 671-0748
ই-মেইল: info@islamicpublishing.org
ওয়েবসাইট: www.islamicpublishing.org
Language: Bengali

এরকাম প্রকাশনী

অর্থ অনর্থের মূল নয়

ওসমান নূরী তপবাস

এরকাম প্রকাশনী

সূচিপত্র

সূচিপত্র ৫
প্রথম কথা ৭
সম্পদ দিয়ে মুমিনের পরীক্ষা বিষয়ক উসমান নূরী
তপবাসের সাথে আলতনউলুক পত্রিকার সাক্ষাৎকার ১১
"এসব কাজ এভাবেই হয়" প্রবক্তাদের মানসিকতা ১৯
মানবিক বিপর্যয় ২৩
ইসলামের তিনটি মূলনীতি ২৬
পুঁজিবাদ ও ইসলাম ৩০
স্বর্ণযুগেও সম্পদ ছিলো পরীক্ষা ৩২
দূর্বলতা কি ওজর? ৩৮
প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাকওয়ার লৌহবর্ম ৪০
ধনাঢ্যতা কি মুসলমানিত্ব কেড়ে নেয়? ৪৩
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী অবস্থান ৪৯
হীনমন্যতা রুঁখতে করণীয় ৫৪
যেভাবেই আয় করো প্রকৃত আয় নেই ৬২
গাড়াওদী'র সাথে একটি স্মৃতি ৬৫
ইমাম আবু হানিফা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত ৬৯
একশ' ধনী যদি একত্র হয় ৭৪
সম্পদের কত ভাগ দান করা উচিৎ? ৭৮
ইসলাম শিফাখানার নাম ৮১
সম্পদের পরীক্ষায় তাসাউফের ভূমিকা কী? ৮৪
বিপদে নিরাপদ আশ্রয় ছিলো খানকাহগুলো ৮৭
সমাজে যদি ইসলাম সক্রিয় থাকে... ..... ৯০
দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতার পরীক্ষা ৯১

গাফিল হওয়া ৯৫
স্বল্প খরচ করে বেশি বেশি দান করা..... ৯৯
অপব্যয় ও বিলাসিতার সীমা.....১০১
সাহাবাদের অনুসরণ ১০৯
স্বর্ণের পাল্লা আর কাঠের স্কেল ১১২
কাবাবের গন্ধ ও প্রদর্শনী ১১৪
শরীয়তের হুকুমগুলো কি শুধু ওলীদের জন্য? ১১৭
মূল সমস্যা আত্যশুদ্ধির অভাব ১২২
শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক..... ১২৫
পুঁজিবাদী সমাজে ইসলামী জীবন যাপন..... ১২৮
ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রবেশ..... ১৩০
ব্যবসায়ীদের বিপ্লব প্রয়োজন ১৩৩

প্রথম কথা

সে মহান আল্লাহর তরে সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে আমাদের ডুবিয়ে রেখেছেন। তিনি এই জগতকে আমাদের পরীক্ষাগার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেখতে চান আমাদের মাঝে কে কত ভালো আমল করে তাঁর কাছে হাজির হতে পারে।

এরপর দরূদ ও সালাম পাঠ করছি প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যিনি বিশাল এই পরীক্ষাগারে আমাদের পথপ্রদর্শন করে গেছেন। তিনি ছিলেন সকলের মুয়াল্লিম। আরও সালাম প্রেরণ করছি তাঁর যোগ্য শাগরেদ সাহাবাগণ ও পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমাদের ইসলাম ধর্ম নিচক কিছু বিশ্বাস ও আক্বীদার নাম নয়; বরং ইসলাম হলো, পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলাম আমাদেরকে শেখায় না। অর্থাৎ ইসলাম আক্বীদা বিশ্বাস থেকে শুরু করে অধিকার ও দায়িত্ব পালনের সব বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামের আছে নিজস্ব একটা জীবনব্যবস্থা। এতে কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির জায়গা নেই। মধ্যম পন্থা ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে একজন খাঁটি মুসলমান কিছুতেই বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতে পারে না। তেমনি ব্যবসায়ী জীবনে অন্যের রক্ত চুষে হলেও নিজের পেট ভারি করার মত ঘৃণ্য মতবাদ ইসলাম লালন করে না; যেমনটি সমাজবাদ ও পুঁজিবাদে দেখতে পাওয়া যায়।

হালাল হারাম, হুকুকুল ইবাদ তথা অন্যের অধিকার খর্ব করা, মিথ্যা বলা, ধোকা দেয়াসহ এধরণের বহু বিষয়ে ইসলাম কঠোরতা আরোপ করেছে। বলাবাহুল্য এসব বিষয় সবচে' বেশি প্রয়োজন হয় ব্যবসায়ী জীবনে। ব্যবসায়ীরা শরয়ী হুকুমগুলোর তোয়াক্কা না করলে একসময় দুনিয়ার ভালোবাসায় সব হারামকে হালাল মনে করতে শুরু করে। আর এটা তাঁদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। কারণ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াটা গুনাহের কাজ। কিন্তু হারামকে হালাল মনে করা কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সামাজিক আগ্রাসন, গ্লোবান দুনিয়ার হরেক রকমের আবেদনে মুসলিম সমাজ এতোটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যে, ব্যবসায়ী জীবনে ইসলামের আদর্শকে বিদায় করে দেয়ার উপক্রম হয়েছে। যেনো পুঁজিবাদী গোষ্ঠী চাইলে হাতের ইশারায় মুসলিম দুনিয়াকে পরিচালনা করতে পারছে। তারা যেদিকে যেতে বলছে সেদিকেই চোখ বন্ধ করে মুসলিম বিশ্ব দৌড়ে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মিডিয়ার কল্যাণে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা বস্তুবাদী মানসিকতায় বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। দয়া মায়া, করুণা মমতা যেনো তারা ভুলতে বসেছে। স্বার্থবাদী চিন্তা চেতনা লালন করার কারণে মুসলমান হিসেবে তাদের যে আধ্যাত্মিকতা ছিলো তাও হারাতে বসেছে।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, শয়তান আমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানদের মাঝে অংশীদার হবে। তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তার বিশেষ কাজই হলো মানুষদের পথভ্রষ্ট করা ও তাদের সম্পদে হারামের অনুপ্রবেশ করানো। এবং সে এই কাজে অনেকাংশে সফলতাও লাভ করে। তাই শয়তানের এসব ধোকা থেকে বাঁচতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করার বিকল্প নেই।

প্রিয় পাঠক, আলতিনওলুক পত্রিকায় 'সম্পদ দিয়ে মুমিনের পরীক্ষা' শিরোনামে ২০১২ জুন ও জুলাই সংখ্যায় একটি সাক্ষাৎকার

প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের জনপ্রিয়তা পাওয়া সাক্ষাৎকারটি বই আকারে প্রকাশ করার আবেদন আসতে থাকে। তাই কলেবরে আরেকটু সাজিয়ে সাক্ষাতকারটি বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিই। বইটিতে ব্যবসায়ী জীবনে যেসব মারাত্মক ভুল করা হয় সেগুলোতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আশা করছি ব্যবসায়ী ভাইদেরসহ অর্থনীতির সাথে জড়িত সবার জন্যই বইটি বেশ উপকারে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা কিতাবটিকে কবুল করুন। এবং দুনিয়া নামের এই পরীক্ষাগারে সম্পদের ফেতনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত হাসিলের মাধ্যম বানানোর মত শক্তি সামার্থ তিনি আমাদের দান করুন।

আমীন...

ওসমান নূরী তপবাস
অক্টোবর, ২০১২
উস্কুদার, ইস্তাম্বুল

সম্পদ দিয়ে মুমিনের পরীক্ষা বিষয়ক উসমান নূরী তপবাসের সাথে আলতনউলুক পত্রিকার সাক্ষাৎকার

আলতনউলুক: শেষ জামানায় টাকা পয়সার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে অনেক লেখালেখি ও ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা চলছে। আলোচিত সেসব বিষয়ের কয়েকটি হলো, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ডোনারের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়া, পুঁজিবাদী মানসিকতা, বিলাসিতায় বাড়াবাড়ি, খরচে বাহুল্যতা, আয় ব্যয়ে সীমালঙ্ঘন, সুদি কারবারে জড়ানো, ব্যাংক থেকে ক্রেডিক কার্ডের মাধ্যমে ধার নেয়া, শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাব কন্ট্রাক্টর পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি...।

বাহ্যিক সমালোচনায় বলা হয়, "সুযোগ পাওয়া গেলে আয়ের কোনো সীমা মানা জরুরী নয়। যা পকেটে আসবে সবি হালাল। কারন টাকাই সব সমস্যার সমাধান।"

অভ্যন্তরীন সমালোচনাও পাওয়া যায়। কেউ উপর্যুক্ত বাছবিচারহীন আয়ের সাথে জড়িতদের "পথভ্রষ্ট" বলে। কেউ বলে, "পুঁজিপতি"। কেউ আবার এমন লোকদের "বামপন্থী মুসলমান" বলে নামকরণ করে থাকেন।

আপনি তো আধুনিক এসব সমস্যা নিয়ে গবেষনায় লিপ্ত থাকেন। এবং বর্তমান সমাজের দীনদার মুসলমানদের সামাজিক বহু সমস্যার সন্তুষজনক সমাধান দিতেও সক্ষম হয়েছেন। সফল একজন গবেষক হিসেবে ইসলামমানা মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আপনি কীসব বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান?

ওসমান নূরী তপবাস: মানুষের ব্যক্তিত্বকে আকৃষ্টকারী দু'টো জিনিষ আছে;

এক নম্বর হলো, তার পাশের মানুষগুলো। যাদেরকে সে খুব ভালোবাসে ও যাদেরকে সে অনুসরনীয় মনে করে। দ্বিতীয় প্রকার অকৃষ্টকারী হলো মানুষের লাভ ও আয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুগুলো সুমিষ্ট হয়ে থাকে। এর দৃশ্যও বেশ সুদর্শন, চোখ ধাধানো। দর্শককে আকর্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ এই সুমিষ্ট দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রীকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মালিকানায় দেবেন। তিনি দেখবেন এসব নিয়ামত পেয়ে তোমরা কেমন আচরণ করো। এবতাবস্থায় গাফলতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য দুনিয়ার দাস হওয়া থেকে বিরত থাকো।" (মুসলিম, যিকির, ৯৯)

একারণেই আমরা কাদের ভালোবাসি, কাদের সংস্রবে থাকি, আমাদের উঠাবসা কাদের সাথে- এসব বিষয়ে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। কারণ আমরা জেনে না জেনে আশপাশের লোকগুলো দ্বারা প্রভাবিত হই। এবং তাদের মাধ্যমেই ক্ষেত্রবিশেষ ভুল পথে চলতে উৎসাহিত হয়ে পড়ি।

দ্বিতীয়ত আমাদের পকেটের টাকাগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ। মাঝেমাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করা উচিৎ আমার আয়ের উৎস কী? হারাম আয়ের উৎস থেকে বিরত থাকতে আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সতর্ক অবস্থানে থাকা দরকার।

প্রায় সময় উপর্যুক্ত এই দু'টি বিষয়ের আধ্যাত্মিক প্রভাবের ভিত্তিতেই মানুষের যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হয়। এমনকি ইবাদত বন্দেগীও সংস্রব, সঙ্গ ও পকেটে থাকা টাকাগুলোর হালাল বা হারাম হওয়া হিসেবে রূপ ধারণ করে। সঙ্গদোষে যেমন ইবাদত থেকে দূরে সরে যেতে পারে তেমনি হারাম আয়ের অভিশাপের কারণে ইবাদত কবুল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

টাকা পয়সার ক্ষেত্রে একটা গোপন রহস্য আছে, টাকা যে পথে আসে সে পথেই হাত থেকে চলে যায়। অর্থাৎ হালাল পথে উপার্জিত টাকা পয়সা প্রকৃত অর্থে হালাল ও ভালো কাজেই ব্যয় করার সুযোগ হয়। অপরদিকে হারাম তদবির করে যে টাকা উপার্জন করা হয় সেটি ব্যয় করার জন্যও হারাম কোনো ব্যয়ের উৎস দেখা দেয়।

টাকা পয়সার ব্যয়ের খাত হিসেবে ব্যয়কারী ব্যক্তির ভাগ্য পরিবর্তন হয়। সবাই তো ভাবে আয়ের উৎস যাই হোক আমি পকেটের টাকাগুলো ইচ্ছেমত ব্যয় করতে পারবো। তার অর্থ হলো, হারাম পথে উপার্জন করেও সেসব টাকা দিয়ে আমি ভালো ভালো কাজ করবো। অথচ বাস্তবতা তার উল্টো; উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অপবিত্রতার আধ্যাত্মিক একটা বিষয় আছে। পবিত্রতা অপবিত্রতা হিসেবেই টাকা পয়সা উপযুক্ত খাতে ব্যয়িত হয়। শুধু তাই নয়। টাকার মালিকেরও বিপথে প্রবেশের কারণ হয় হারাম টাকা পয়সা। সহজে বলতে গেলে, টাকা পয়সা কীসব খাতে ব্যয় হবে- এই বিষয়ে বিজয়ী শক্তি অধিকাংশ সময় মালিকের না হয়ে স্বয়ং টাকার হয়ে থাকে। ফলে মালিক তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হারাম টাকাকে ভালো কোনো কাজে ব্যয় করতে পারে না; উল্টো হারাম টাকা হারাম পথে ব্যয় হয়, মালিককেও হারামে লিপ্ত করে।

"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে তারা (হিসাব দেয়ার জন্য) পুনরুত্থিত হবে সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।" (মুতাফ্ফিফীন, ১-৬)

টাকা পয়সার উদাহরণ সাপের সাথে খুব মানায়। কারণ টাকা পয়সাও সাপের মত যে গর্ত দিয়ে প্রবেশ করে সে দিক দিয়েই বের হয়।যে ব্যক্তির পকেটে হারাম টাকা পয়সা প্রবেশ করে তার আমল আখলাক ইবাদত বন্দেগী নষ্ট হয়ে যায়। এমন ব্যক্তির ইবাদতে ইখলাস বলতে কিছু থাকে না

এতক্ষণে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝে এসেছে, হালাল পথে উপার্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমপক্ষে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য হলেও আমাদের পক্ষে হারাম থেকে বেঁচে থাকার বিকল্প নেই।

আলোচ্য বিষয়ে বাহলুদ দানা'র সুন্দর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে-

একদিন বাহলুল বাদশাহ হারুনুর রশিদের কাছে একটি চাকরি তলব করেন। বাদশাহ তাকে হাট বাজারের ন্যায় অন্যায় দিকগুলো দেখা শোনার দায় দায়িত্বে নিয়োগ করেন

বাদশার সম্মতিতে বাহালুল তাৎক্ষণিক নতুন চাকরিতে নেমে পড়েন। প্রথমেই তিনি একটি রুটির দোকানে প্রবেশ করেন। একটি একটি করে দোকানের রুটিগুলো ওজন করতে শুরু করেন। প্রতিটা রুটিই বাহলুলের কাছে নির্ধারিত ওজন থেকে কম মনে হয়।দোকানদারেরর দিকে মুখ করে বাহলুল জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি নিজের অবস্থানের উপর সন্তুষ্ট আছো? তোমার পরিবার বাচ্চাকাচ্চা কেমন আছে? তারা কি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট? তাদের পানাহার পোশাকাদি নিয়ে তাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে?

আব্দুল কাদির জিলানী রাহ. বলেন,

"হারাম লোকমা অন্তরকে মেরে ফেলে (আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গাফলতে লিপ্ত করে।) এর বিপরীতে হালাল লোকমা অন্তরে শক্তি জোগায়। কিছু খাবার তোমাকে দুনিয়াদার বানিয়ে দেবে আর কিছু খাবার তোমাকে আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয়ে পথ দেখাবে। তাকওয়ার শর্ত পূরণ করে হালাল পথে উপার্জিত লোকমা তোমাকে আল্লাহর কাছে পৌছাতে সহযোগিতা করবে।"

দোকানী বাহলুলের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে না সূচক জবাব দেয়। সে জানায়, তার জীবনে শান্তি প্রশান্তি বলতে কিছু নেই। আপন জীবন নিয়ে সে খুব পেরেশান।

বাহলুল কিছুই না বলে বেরিয়ে গেলেন। এবং পার্শ্ববর্তী আরেকটি দোকানে প্রবেশ করেন। সেখানেও তিনি দোকানের রুটিগুলো ওজন করতে আরম্ভ করেন। এবার বাদশাহ কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের থেকেও বাহলুলের কাছে রুটিগুলোর ওজন বেশি মনে হয়।এই প্রেক্ষিতে বাহালুল এই দোকানীকেও পূর্বে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো করেন। উত্তরে দোকানী জানায়,সে খুব সুখে শান্তিতে আছে। তার জীবনের প্রতি সে সন্তুষ্ট। চলমান জীবন নিয়ে তার কোনো অভিযোগ নেয়। বিপরীতমুখী এই দুই দোকানের অবস্থা দেখে বাহলুল ভেঙে পড়েন। সাথে সাথে বাদশার

দরবারে হাজির হয়ে বর্তমান চাকরি থেকে অব্যাহতি চান। পাশাপাশি অন্য একটি চাকরিতে নিয়োগ করার আবেদনও পেশ করেন।

হারুনুর রশীদ বললেন, সবেমাত্র তোমাকে দায়িত্বে নিয়োগ দিলাম। এত তাড়াতাড়ি কেন অব্যাহতি নিতে চাচ্ছো? বাহলুল বললেন, বাজারের অন্যায় অবিচারের সাথে দোকানীদের জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। আমার পূর্বেই কেউ একজন ন্যায় অন্যায় পরীক্ষা করার জন্য রুটিগুলো ওজন করে নিয়েছে। সে অনুযায়ী দোকানীরাও নিজেদের প্রতিদান বরণ করেছে। প্রত্যেকেরই উপযুক্ত প্রতিদান ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েগেছে। আমার বাজারে করার মত কিছু নেই।

উপরের ঘটনা থেকে বুঝে আসে, উপার্জনের হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রতিটি ব্যক্তির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি প্রশান্তি লাভের প্রথম শর্ত। কেননা যে লোকমা মুখে প্রবেশ করানো হয় সেটি হালাল হলে ব্যক্তিকে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে। কিন্তু যদি হারাম হয় কিংবা সন্দেহযুক্ত কোন লোকমা হয় তবে এই হারাম খাবার তাকে আল্লাহবিমুখতায় লিপ্ত রাখে। এবং ব্যর্থতা ডেকে আনে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ চেনার ক্ষেত্রে তার অন্তরে একটি পর্দা ফেলা দেয়া হয় । এজন্যই প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আলি রামিতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, *"ইবাদতের দশটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে নয়টি হালাল খাবারের সাথে সম্পর্ক রাখে। অবশিষ্ট যাবতীয় ইবাদত একটি মাত্র অংশের অন্তর্ভূক্ত।"*- হাদীসটি পড়ার পর বলেন, "যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণ করে না সে আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ কিছুতেই পেতে পারে না। আল্লাহর নাফরমানি এবং কু-প্রবৃতির সাথে জড়িত থাকবে সে। তার বিপরীতে হালাল ভক্ষণকারী সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দা

হাদিস শরীফে এসেছে,
"আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে হালাল রুজি রোজগারের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে ভালোবাসেন।" (সুয়ূতী, জামিউস সাগীর, ১ম, ৬৫)

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহ. বলেন,

"একদা সকালে আমার কাছে ইলহাম আসা বন্ধ হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত বুঝে নিলাম, না জেনে হয়তো আমার পেটে হারাম লোকমা চলে গেছে। ইলম ও হেকমত হালাল লোকমা থেকেই আসে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়াও হালাল লোকমার বরকতে আমাদের মাঝে পয়দা হয়। যে খাবার ভক্ষণ করার পর আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল হতে শুরু করবে, মনে করবে তোমার সে খাবারটি সন্দেহযুক্ত কিংবা হারাম খাবার ছিলো।"

হিসেবে জীবন যাপন করবে। এককথায়বলতে গেলে, হালাল রুজি উপার্জন তাকওয়ার অন্যতম শর্ত।

একবারের ঘটনা। আল্লাহর ওলী সুফিয়ান সাওরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে নামাযের প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযিলত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি হালার রুজি রোজগারের বিষয়টিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "ভাই! তোমার পকেটের টাকাগুলো কোত্থেকে আসে এই বিষয়টিতে তুমি গুরুত্ব দাও। তোমার আয় ব্যয় হালাল হলে নামায তুমি সামনে বা পেছনে- যে সারিতেই পড়ো তাতে কোনো অসুবিধে নেই। প্রথম কাতারেই নামায পড়তে হবে এমন কোনো দায়িত্ব তোমার কাধে দেয়া হয় নি।"

অপর আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে সুফিয়ান সাওরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "প্রত্যেকের দীনদারি আয় রোজাগারের হালাল বা হারাম হওয়ার ভিত্তিতেই নির্ণয় করা দরকার" বলেছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তব হলো, বর্তমানে পুঁজিবাদী মানসিকতা সবখানে ও সবার মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। পুঁজিবাদীদের এই ভয়াবহ আক্রমনের বাইরে কেউ নেই। একজন দীনদার ব্যবসায়ীও জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে ব্যবসার স্বার্থে এমন এমন লেনদেনে জড়িয়ে যায় যেসব লেনদেন ইসলাম সমর্থন করে না। প্রতি বছর হজ্জে গমনকারী, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও মনোযোগী এমন অনেক মানুষকেও বলতে শুনা যায়, 'আমি সেবামূলক ভালো কাজ করতে চাই।' ভালো কাজ করতে টাকা পয়সার বিকল্প নেই। সুতরাং দীনের স্বার্থেই আমাকে ইনকামে

মনোযোগ দেয়া উচিৎ।' এটুকু বলেই তারা ক্ষ্যান্ত থাকে না। ভাল কাজ করার দোহাই দিয়ে বাছবিচার না করে অর্থ উপার্জনের জন্য হারাম পথে পা বাড়াতেও কুণ্ঠিত হয় না। এসব করে তারা হালাল ব্যবসাকে হারামের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলে।

বাস্তবতা হলো, কোনো হারাম কাজকে মুবাহ বা জায়েয সাব্যস্ত করা হারামে লিপ্ত হওয়া থেকেও শতগুণে ভয়াবহ। এমন কি হারামকে মুবাহ জ্ঞান করার কারণে, আল্লাহর কৃত হারামকে হালাল হিসেবে বিশ্বাস করার অপরাধে ঈমান পর্যন্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। অর্থাৎ ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কিছুকে বৈধ সাব্যস্ত করার মূল ক্ষতি হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধারণ কোনো ভুলের থেকেও সামনে বেড়ে তার ঈমানে আঘাত হানা। এককথায় বলতে গেলে, হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া ঈমান বিধ্বংসী নয়; কিন্তু হারামকে হালাল সাব্যস্ত করা ঈমানবিধ্বংসী।

হারামে লিপ্ত ব্যবসায়ীদের একটি দল ব্যবসায়ী জীবনকে গ্রাস করে নেয়া পুঁজিবাদের নিয়ম কানুনগুলো মেনে নেয়ার বিকল্প নেই বলে হাহুতাশ করে। অথচ দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার সে পরিমাণ উপার্জনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া না হওয়া একান্তই সবার ব্যক্তিগত বিষয়। উপার্জনের জন্য ব্যবসাই করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাদকতা নেই। যদি একান্ত ব্যবসা করতেই হয় তবে হারাম পথে জড়িয়ে যেতে হবে- এটাও জরুরী কিছু না। হারামে না জড়িয়েও ব্যবসা চালানোর সুযোগ এখনো আছে।

উপার্জিত সম্পদের খাঁটি হালাল হওয়া বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে বলতে পারি, হালাল একটি টাকা হারাম পথে আসা হাজার টাকা থেকেও উত্তম। হারাম সন্দেহযুক্ত টাকা পয়সা ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করে দেয় এবং অন্তরের প্রশান্তিকে দূর করে দেয়। এর বিপরীতে হালাল ও পবিত্র অর্থ সম্পদ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির কারণ হয় এবং বরকতের ওসিলা হয়।

সবসময়ের মত বর্তমানেও অধিকাংশ লোক নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনের বিপরীতে জীবন যাপনের ভিত্তিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে কোনো কোনো হারাম কাজে জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে যাওয়া হারাম থেকে তারা বের হতে পারে না। এক পর্যায়ে হারামটা তাদের কাছে আর হারাম মনে হয় না। হারামকে হালাল মনে করতে শুরু করে। আর এই বিশ্বাসই তার ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে দাড়ায়।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই ব্যবসার সাথে জড়িত প্রতিটি মুমিন মুসলমানকে খুব ভালো করে জানতে হবে, তার ব্যবসায়ী ক্রিয়াকর্ম নিছক কোনো দুনিয়াদারি না। ব্যবসার সাথে তার ঈমানের সম্পর্ক আছে। সুতরাং হারাম থেকে বেচে থাকতে তাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

"এসব কাজ এভাবেই হয়" প্রবক্তাদের মানসিকতা

ব্যবসার জগতে আজকাল অন্যায় অপরাধ ছেয়ে গেছে। অনৈতিক এ্যাডভ্রাইজ ও ক্যাশিয়ারের ডেস্কে আকর্ষণীয় নারীদের বসিয়ে রাখা সেসবের কিছু উদাহরণ মাত্র। এধরণের ব্যবসায়ী মানসিকতার ক্ষেত্রে দুনিয়ার লোভ লালসার ও মোহ আখেরাতের চিন্তার উপর প্রাধান্য লাভ করে। ফলে প্রবৃত্তি **"বর্তমান যুগে ব্যবসা এভাবেই করতে হয়"** বলে বলে অন্তসারশূণ্য তালবাহানা পেশ করে। স্পষ্ট হারামকে হালাল বানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত করে। অথচ স্বীকৃত নিয়ম হলো, হারাম কোনো পদক্ষেপের পেছনে গ্রহন করার মত ওজর আপত্তি ও সঠিক নিয়ত থাকতে পারে না। অধিকন্তু **"ভবিষ্যতে আমি অনেক বেশি ভাল কাজ করার জন্য অর্থ উপার্জন করছি"** যুক্তির ভিত্তিতে হালাল হারামের সীমা অতিক্রম করা সবচে' মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া ও শয়তানের প্ররোচনায় নিজেকে লিপ্ত করার নামান্তর।

সমাজ ও পরিচালনা পদ্ধতির উঁচু মাকামগুলোতে বড় বড় পুঁজিপতিদের প্রভাব আছে। বলাবহুল্য পুঁজিবাদী মানসিকতায় যৌক্তিক কোনো দিক খুঁজে পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতা বলতে কিছু নেই পুঁজিবাদে। বিপরীতে প্রবৃত্তির লাগামহীন তাবেদারির কারণে পুঁজিবাদী চিন্তা চেতনায় আত্মার খোরাক নেই। আধ্যাত্মিকতার নূর থেকে নিঃস্ব এক থিওরির নাম পুঁজিবাদ। এই থিওরিতে মানবতার দায়বদ্ধতার ছিটেফোঁটাও নাই। পুঁজিবাদ দয়া ও মানবতা ভুলিয়ে দেয়। আরো চাই আরো চাই মানসিকতা লালান করার ফলে **"সুযোগ দাও যা ইচ্ছে তাই করুক, কিছু বলো না ইনকাম করতে দাও"** বলে বলে হাসি মুখে অন্যের কষ্ট দেখতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। অধিনস্তদের হাজারো দুঃখ কষ্ট, অসহায়ত্ব উঁচু শ্রেণীর লোকদের সামান্যতম প্রভাবিত করে না।

অন্যকে চুষে নেয়ার চিন্তা চেতনার কারণে পুঁজিবাদে ধনিকে আরো ধনি বানানোর নামে বিবেক ও অন্তরকে আকৃষ্টকারী নতুন নতুন মডেলের তেলেশমাতি দিয়ে কোম্পানীগুলোর সহায়তায় নানা রকমের প্রোপাগাণ্ডা পরিচালিত করে। অর্থনীতিকে ব্যয়বহুল করে তোলার স্বার্থে প্রচারনা চালায়। কেননা পুঁজিবাদের মূল শক্তি অত্যধিক ব্যয়ের মধ্যেই নিহিত।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর কারণে প্রথমেই আমাদেরকে ব্যয়বহুল অর্থনীনৈতিক চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'যত ব্যয় ততো আয়' মানসিকতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। কারণ শরিয়তে একে ইসরাফ বলে। আর ইসরাফ, সীমাহীন খরচাদি ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনে অভ্যস্থ হওয়া লোকগুলো পুরো সমাজকে পেরেশান করে তোলে।

বর্তমান সমাজের ব্যাংকপদ্ধতি ইসরাফের পথে ভয়ংকর পদক্ষেপ রেখে চলেছে। কারণ ব্যাংকগুলো বেহিসেব খরচাদির জন্য ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ দিচ্ছে। সাধারণ গ্রহিতারাও ক্রেডিট কার্ডের এই ধোকায় পড়ে অপ্রয়োজনীয় ও লাগামহীন ব্যয়ে মেতে উঠে। অথচ ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের জন্য বিশেষ এক শোষণ পদ্ধতি। জীবন চলার পথে ছোট ছোট প্রয়োজনগুলোকে বাহানা বানিয়ে ক্রেডিট গ্রহন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

ব্যাংকের লোন দেয়ার সিস্টেমটা এমন এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র যে, নির্দিষ্ট কিছু লোক ধনী থেকে আরো ধনী হওয়ার লোভে এই ষড়যন্ত্রে দুস্থ গরীবগুলোকে ফাঁসিয়ে দেয়। ব্যাংকের এসব কর্মকাণ্ড ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানেও আঘাত হানে। কখনও বা এতেও ক্ষ্যান্ত না থেকে সমাজের রীতিনীতিকে উলটপালট করে দেয়। সমাজের ভারসাম্য বিনিষ্ট করে। আখলাক চরিত্র বলতে সমাজে কিছু থাকে না।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট আকারে ধরা পড়ে। সমাজের যেসব লোক সাধারণ জীবন যাপনকে পরিহার করে;

লৌকিকতাপূর্ণ ব্যয়বহুল জীবন যাপনকে গ্রহন করে এবং বিনয়ী বেশে সমাজে চলা ফেরা করার পরিবর্তে যারা অহংকারীর চাদর গায়ে দিয়ে সমাজে নিজেকে বড়লোক হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় তারাই ব্যাংকের এই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যায়। এছাড়াও মধ্যবিত্ত ও লোভী অজ্ঞ মূর্খ নিতান্ত গরীবদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়।

দীনের মৌলিক আদেশগুলোর একটি হলো, বিনয়ী হওয়া। চলা ফেরা ও জীবন যাপনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। মধ্যম পন্থার এই শিক্ষা উঠে যাওয়ার কারণে ধনী ও গরীবের মধ্যকার আকাশ পাতাল তফাতকে মিটিয়ে দেয়ার প্রধান হাতিয়ার যাকাত, সদকা ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের মানসিকতাও উধাও হয়ে গিয়েছে। এর ফলে কত যে সমস্যা সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে তার ইয়াত্তা নেই। চোখ ধাঁধানো ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের কারণে হাজারো দরিদ্র মানুষ অবৈধ পথে আয় রোজগারে বাধ্য হয়ে পড়ছে।

> "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।"
>
> (বাকারা, ১৮৮)

সমাজে দেখবেন নিতান্ত গরীব কোমল হৃদয়ের ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের বলা হয়, (এই বলাটা ভাষায় হোক কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে) "তুমি উচ্চমানের পোশাকাদি ও ওমন ওমন স্টাইল অবলম্বন করলেই কেবল সবার কাছে মর্যাদার পাত্র হতে পারবে। বিশেষ প্রকারের অধুনিকতা গ্রহন করেই তুমি আরো বেশি আকর্ষণীয় হতে পারো।" নির্বোধ মেয়েটি না বুঝে ধোকায় পড়ে যায়। ফলে উচ্চাভিলাষের কথা বলে বলে বেচারির মানসিক জগতটাকে উলট পালট করে দেয়া হয়। ফলাফল এই হয় যে, দরিদ্র মেয়েটি তার সাধ্যের বাইরে উঁচু মানের জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু একপর্যায়ে পরিবার তার

হযরত উমর রাদি. বলেন,
"সবচে' বড় জাহিল হলো, যে দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখেরাতকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়।"

আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে না ভেতরের সুপ্ত লোভের কামনা বাসনা আরো মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে। ফলে ব্যয়বহুল জীবন যাপনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সে অবৈধ কাজেও জড়িয়ে যায়। এভাবেই কোমল হৃদয়ের একটি শিশু সমাজের নিকৃষ্টতম সদস্য হিসেবে গড়ে উঠে। নিজেকে সমাজের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করে। কতটা দুঃখজনক!

এজন্যই বলতে হয়, এই জগতে শান্তি ও সন্তুষ্টির সোনার হরিণ পেতে হলে সর্বপ্রথম "অল্পতুষ্টি ও আল্লাহর দেয়া রিজিকের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশের প্রসংশনীয় গুণের" মত আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এসব ইলাহী গুণগুলোকে আমাদের অন্তরে জায়গা করে দিতে হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
যে ব্যক্তি মুত্তাকী, অন্তরের ধনী, নিজ অবস্থায় আপন দায়িত্ব ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে- আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। (মুসলিম, যুহদ, ১১)

মানবিক বিপর্যয়

আজকাল বৈশ্বিক সংস্কৃতির সামাজিক আগ্রাসন, টিভি ও ইন্টারনেটের নেতিবাচক উদ্দীপনা ভয়ংকর আকারে পরিচ্ছন্ন হৃদয়গুলোকে বিষপান করিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি এসব কিছুই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাড়া গাছটির গোড়ায় পানি সরবরাহ করছে।

হিংস্র পুঁজিবাদের ফলাফল হলো, মানবিক একটি বিপর্যয় ও অবক্ষয়। ফলে এই পুঁজিবাদ অন্যের চোখের পানির প্রতি দয়া মায়া রাখে না; অনুগ্রহ ও পরশ্রীকাতরাকে ভুলিয়ে দেয়। অথচ এসব গুণ অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়। এককথায় পুঁজিবাদ হৃদয়ে প্রশান্তিদায়ক 'মলমটির ফার্মেসি'র দরজাতেও তালা ঝুলিয়ে দেয়।

পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও সাম্যবাদ- যাই বলি, এগুলোর একটাতেও মান মর্যাদা ও হৃদয়ের আকুতি বলতে কিছু নেই। একটিতে সমস্ত মালিকানা সমাজের সাব্যস্ত করা হয়; আরেকটিতে যার যার ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এই মতবাদগুলোর দৃষ্টিতে সম্পদের মূল মালিক কে হবে- সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কিন্তু উভয়টিই স্বার্থপর ও শোষক। অন্যকে শোষণ করা ও নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার বিষয়ে উপর্যুক্ত সবগুলো মতবাদ একমত। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। এই জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সম্পত্তি। আমাদের কাছে ওসব শুধু বর্তনী দেয়া হয়েছে। আমরা সম্পদগুলোকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমানত হিসেবে দেয়া এসব সম্পদের রক্ষক আমরা। আমাদের দায়িত্ব হলো এগুলোকে পাহারা দেয়া। এই কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার জাগতিক লোভের পেছনে পড়া, দরিদ্র অসহায়

ব্যক্তি ও সমাজকে শোষণ করা, বান্দার হক নষ্ট করা ও আয় রোজগার করতে গিয়ে ইলাহী সীমারেখা অতিক্রম করার কোনোও অনুমতি নেই। ইসলামী অর্থনীতির প্রথম লক্ষ্য হলো, মানবতার কল্যাণে কাজ করা। সমাজের লোকদের সমস্যাগুলো দূর করা। তাই ইসলাম মনে করে ধনীদের সম্পদ গরীবদের মাঝে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করে দেয়া ফরজ। ধনীদের সম্পদে গরীবদেরও হক আছে। সে হক না দিলে ধনীদের সম্পদ হালাল হয় না। সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য তাদের হক দিয়ে দেয়া শর্ত।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"প্রতি সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! তোমার পথে ব্যয়কারীকে নতুন নেয়ামত দান করো।" দ্বিতীয় ফেরেশতা দু'আ করে, " হে আল্লাহ! কৃপণ থেকে আপনার নেয়ামত ছিনিয়ে নিন।" (বুখারী, যাকাত, ২৭; মুসলিম, যাকাত, ৫৭)

কুরআনের একটি আয়াতে আছে, **"ধনীদের ধন-সম্পদে মুখাপেক্ষী ও বঞ্চিতদেরও বিশেষ একটা হক আছে।"** (যারিয়াত, ১৯)

মানবতার কল্যাণে এটাই মূলনীতি। সম্পদ ব্যয়ের শিক্ষা এমনি হওয়া উচিৎ। কেননা এতে সম্পদের ব্যয়ের পদ্ধতি বলে দেয়ার সাথে সাথে গরীবদের মন জয় করার সূক্ষ্ম ওসীলাও বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম মানব জীবনের আর দশটা সেক্টরের মত ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিশেষ এক থিওরীর প্রবক্তা। অর্থনৈতিক জীবনেও একজন মুসলমানকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কারণ তার সামনে হালাল ও হারামের এক সীমারেখা আল্লাহর পক্ষ থেকে টেনে দেয়া হয়েছে। দরিদ্রদের প্রতি দয়া, রহমত, করুণার আদেশ করে একজন মুসলমানকে আরেক মুসলমানের অভিভাবক সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুসলমানের আয় রোজগারের ক্ষেত্রে **'হক'**, **'আদালাত'** ও **'করুণা'**র সাথে একাকার করে দেয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো একজন মুসলমানের সম্পদে অবশ্যই বিদ্যমান থাকাটা ইসলামের দাবি।

পুঁজিবাদ শুধু নিজের স্বার্থটাই বুঝে। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে দরিদ্র মানুষগুলো হলো, অর্থনীতির চাকা ঘুরানোর একটা যন্ত্র মাত্র। গাড়ির চাকার মত স্বার্থহীন খেটে যাওয়ায় তার কাজ। গাড়ির চাকা ও দরিদ্র মানুষ- এ দু'য়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এজন্যই পুঁজিবাদ দয়াহীন শোষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত হয় না। আপন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সব ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বৈধ মনে করে।

পুঁজিবাদের বিপরীতে ইসলাম মানবিক একটি হিসেব নিকেশকে সবসময় সামনে রাখে। **"কোত্থেকে ও কীভাবে সম্পদ উপার্জন করেছো; কোথায় ও কী উদ্দেশ্য উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করেছো"** এই প্রশ্নটি ইসলাম তার অনুসারীকে করে থাকে।

ইসলামের তিনটি মূলনীতি

অর্জিত সম্পদ সঠিক পথে ব্যবহার করতে পারা বিশেষ একটি শিল্প। এর মাধ্যমে মনের বাসনাকে দলিত করতে হয়। সবাই সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে জানে না। তাই ইসলাম সঠিকভাবে সম্পদ ব্যয়ের কিছু মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন-

১. সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জন করতে হবে।

২. উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে ইসরাফে জড়ানো যাবে না।

৩. প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। অর্থাৎ কৃপণতা করা যাবে না।

ইসরাফ শরীয়তের একটি পরিভাষা। ইসরাফের মূল কথা হলো, নিজের সামর্থকে লৌকিকতার নামে নীচু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ করা। আর কৃপণতার পরিচয় হলো, "ব্যয় করলে ফকীর হয়ে যাবে"- শয়তানের এই প্ররোচনায় কান দিয়ে প্রয়োজনীয় খাতেও ব্যয় না করা এবং শুধু নিজের ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখা। কৃপণতা প্রকৃত অর্থে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার ক্ষেত্রে বান্দার দূর্বলতাকেই প্রকাশ করে। সম্পদের উপর নির্ভর করা, সম্পদের আশ্রয় নেয়ার মানসিকতা থেকেই কৃপণতা জন্ম নেয়।

এই তিন প্রকারের মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে,

১. নিজের শান্তির চিন্তা করে প্রয়োজনীয় দায়িত্বে অলসতাকারী।

২. কষ্টে পতিত ও মাহরুমদের সঙ্গ না দিয়ে তাদের থেকে দূরত্ব রক্ষাকারী।

৩. জালিম ও আল্লাহর ইবাদতে অলসতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বা ইসরাফ ও কৃপণতা- এই দু'টোই মূলত সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল।

একজন খাঁটি মুমিন ইসরাফ ও কৃপণতা থেকে দূরে থাকে। এ দু'য়ের মধ্যমপন্থাটি অবলম্বন করে। ইসরাফ ও কৃপণতার বিপরীতে মুমিন বান্দা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করতে সচেষ্ট থাকে। যে মুমিন বান্দাকে আল্লাহ সম্পদের প্রাচুর্যতা দিয়েছেন সে সবসময় বেশি বেশি আল্লাহর রাহে ব্যয় করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। বেশি থেকে বেশি ব্যয় করতে পারার আশায়-ই সে আরো বেশি সম্পদ লাভের চেষ্টা করে। মুমিনের জীবনে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার গুরুত্ব অত্যধিক বেশি। তাই পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই শ' আয়াতে 'ইনফাক' শব্দটি উল্লেখ করে মুমিনদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করার প্রতি আহবান করা হয়েছে। হাদিসেও *"দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম"* বলে মুমিনদেরকে গ্রহীতা না হয়ে দাতা হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (বুখারি, ওসায়া, ৯)

এছাড়াও মুত্তাকী মুমিন প্রতিটি নতুন দিনে পদার্পণ করার আগে নিজেকে সম্বোধন করে বলে,

"আজকের এই সকালে পৌঁছতে পারার অর্থ হলো, আল্লাহ জীবন নামের গাছটির আরো একটি পাতা তোমার সামনে তুলে ধরেছেন। আজ দিনভর তুমি কতটুকু

আবু যর রাদি.-এর নিম্নোক্ত কথাগুলো কতইনা ফায়দাজনক,

"প্রতিটি সম্পদে তিনজন শরীকদার থাকে। প্রথম শরীকদার তো সম্পদের মালিক। অর্থাৎ তুমি স্বয়ং। দ্বিতীয় শরীকদার, তাকদীর। সে মালে তোমার ভালো তাকদীর লেখা আছে নাকি ধ্বংস ও মৃত্যুর মতো ভয়ংকর কিছু তাতে লুকিয়ে আছে সেটা তোমার জানা নেই। তৃতীয় শরীক হলো, তোমার পরবর্তী উত্তরাধিকারী। সে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে চায়। তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে সে সম্পদে ভাগ বসায়। তুমিও সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। সে হিসেবও তোমাকে দিতে হবে। সামর্থ্য থাকলে এই তিন শরীকের সবচে' দূর্বল শরীক তুমি হয়ো না। অর্থাৎ সময় ও সুস্থ থাকতে নিজ হাতে সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে শেখো। (আবু নুআইম, হিলয়া, ১ম, ১৬৩)

নিজের স্বার্থে আর কতটুকু অন্যের তরে কাজ করবে? দেখে, আল্লাহ তোমাকে এমন বহু নেয়ামত দান করেছেন তোমার পাশের লোকটিকে দেন নি। এর অর্থ কি তুমি জানো? এর অর্থ হলো, বঞ্চিত ঐ লোকটির দায়িত্ব আল্লাহ তোমার ঘাড়ে দিয়েছেন।"

তাই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে এসেছে, **"মুহতাযদের প্রতি দয়াশীল হও। যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করেছেন।"** (আনকাবুত, ৭৭)

শাইখ ইসমাঈল আতা রাহ. নিম্নোক্ত নসিহতটি একজন সাচ্চা মুমিনের মনের বাসনা অত্যন্ত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলে,

"রোদে ছায়া হও, শীতের সময় সোয়েটারের কাজে লাগো এবং ক্ষিদের হালতে ভাতের মতো কাজে লাগে।" (এভাবেই তিনি একজন মুমিনকে পরোপকারের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।)

কুরআনের এই আদেশকে বাস্তবায়ন করণার্থে একজন মুমিন ভিন্ন মাত্রার এক আবেগ নিয়ে সৃষ্টির সেবায় লিপ্ত হয়। বঞ্চিত মুহতাযদের প্রয়োজন মেটাতে দয়ামাখা হৃদয় দিয়ে তাদের দ্বারে দ্বারে যায়। অভাবীদের অভাব মোচন করাকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব মনে করে।

মাওলানা রুমী অন্যের প্রতি মুমিনের দরদ কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে কতই না সুন্দর বলেছেন, "শাম্‌সুত তিবরিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটা শিক্ষা আমি মনে গেঁথে রেখেছি। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, 'দুনিয়ার কোনো এক কোণে যদি একজন মুসলমানও শীতে কাতরায় তবে তুমি উষ্ণ তাপের আনন্দ পেতে পারো না।' রুমী বলেন, আজকাল দেখি দুনিয়ার আনাচে কানাচে অভাবী অসহায়দের করুণ অবস্থা। তাই আমিও আজ আর শান্তিতে নেই।"

শামসুত তিবরিযি তাঁর শাগরেদ মাওলানা রুমীকে আল্লাহর অসহায় বান্দাদের দরদে কাতর হওয়ার জন্য রুমীর মনে মানবতাবোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষেও বাহ্যিক শীত ও কষ্ট কাপড় দিয়ে দূর করা সম্ভব কিন্তু মানবতাবোধে যে আঘাত লাগে সেটি কেবল

দরদমাখা হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়ার মাধ্যমেই দূর হতে পারে। দয়া ও করুণার এই মলম মানবতার প্রতিটি ক্ষতেই ব্যবহার করা দরকার। এই কারণেই সর্ব প্রকারের ধ্বংস ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মানবতাবোধ জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। গোটা জগতে হকের পক্ষে মানবতাবোধে সচেষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়েই ভাঙ্গা হৃদয়গুলোতে আনন্দ জাগানো সম্ভব।

মোটকথা একজন খাঁটি মুমিনের হৃদয় এমন হতে হবে যে,

- উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর মুত্তাকি পরহেযগার একজন বান্দা হতে পারা।

- মাধ্যম হবে, আল্লাহর দুনিয়ায় তাঁর খলিফা হতে পারা ও ইসলামের দর্শনকে বিজয়ী করা।

- ফলাফল হবে, তাঁর হাত ও মুখ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর এমনকি গোটা সৃষ্টিজগত কল্যানের আশা করবে। দয়া ও ভালোবাসার আধারে পরিণত হবে তার হৃদয়।

তিনটি জিনিষের মাধ্যমে দুনিয়া জান্নাতের মতো শান্তির নিবাস হতে পারে,

১. হাত, জবান ও অন্তর দিয়ে দান করা।

২. আল্লাহর দূর্বল বান্দাদের ক্ষমা করা।

৩. জালিমকে হেদায়েতের পথ দেখানো।

পুঁজিবাদ ও ইসলাম

আলনিতওলুক: একটা বিষয় নিশ্চয় আপনার জানা আছে। আজকাল পশ্চিমা বিশ্বে জাগতিক সব বিষয়ে ইসলাম ও পুঁজিবাদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যগুলো নির্ণয় করা শুরু হয়েছে। আমরা দেখছি যেখানেই পশ্চিমা বিশ্ব এই কাজটি করছে সেখানেই ইসলামকে হটিয়ে পুঁজিবাদকে স্থান করে দিচ্ছে। তুরস্ক ত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তালিকায় নতুন একটা দেশ। ভয় হয়, ভবিষ্যতে তুরস্কেও পুঁজিবাদী মাথাছাড়া দিয়ে উঠবে। এবং উপর্যুক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদেরকেও হতে হবে। আর এভাবেই নাকি একজন মুসলমানের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করা হয়। ভয়াবহ এই সমস্যাকে আপনি কীভাবে দেখছেন, এর থেকে বাঁচার কি কোনোও উপায় নেই? পুঁজিবাদ কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের পরাজিত করেই ছাড়বে? অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এদেশেও কি ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু ঈমান আক্বীদা ও চারিত্রিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কি ইসলামের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে পড়বে?

ইমাম শাফেঈ রাহ. বলেন,
"নিজেকে হকের সাথে মশগুল না রাখলে বাতিল তোমার উপর অবশ্যই চড়াও হবে।"

ওসামন নূরী তপবাস: পুঁজিবাদের জন্ম ও বেড়ে উঠা খৃষ্টজগতে। বর্তমানে খৃষ্টানদের আক্বীদা হলো, "মনে প্রাণে বিশ্বাস করো ঈসা তোমার রব। এটুকুই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট।" বিপ্লবের বাতাস তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায় তারা সেদিকেই চলে যায়। ধর্মের অনুশাসন আনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনটাকে বিনির্মাণ করার কোনো চিন্তা তাদের মনে কাজ করে না। তাদের ধর্মের শিক্ষার কোনোও স্থান তাদের সমাজে নেই। ধর্ম থেকে তাদের একটিমাত্র শ্লোগান নজরে পড়ে, 'দয়াশীল হতে হবে।' কিন্তু এও অন্তশারশূণ্য একটি বুলি। তাই দয়ার সংজ্ঞাও তাদের সমাজে ব্যক্তি বিশেষে পরিবর্তন হয়। উদাহরণ

হিসেবে ধরুণ, কারখানার মালিক খাট্টা একটা জুলুমবাজও তাদের সমাজে দরদী হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ কিছু লোকের কর্মসংস্থান করে দিতে পারাটাই তার দয়ার নিদর্শন। এবার সে যত জুলুমই করুক সেসবের কোনো হিসেব কষার দরকার হয় না।

এই হিসেবে পুঁজিবাদের বিপরীতে খৃষ্টানদের ধর্মে আধ্যাত্মিক কোনো শক্তি না থাকার কারনে একচেটিয়া পুঁজিবাদের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করছে। আর যে সমাজে ধর্মের অনুশাসনকে সংকীর্ণ করে ফেলা হবে সেখানে এমনটা হওয়া একদম স্বাভাবিক।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থা খৃষ্টধর্মের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক থেকে শুরু জীবনের এমন কোনো সেক্টর নাই যেখানে ইসলাম তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের বাতলে দেয় নি। জীবনের সব সেক্টরেই আছে ইসলামের দিকনির্দেশনা। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা ইসলামের বাতলে দেয়া পথে হাঁটবে ততোদিন রুক্ষ ও শোষণে অর্থনীতি ইসলামী সমাজে ঠাঁই নিতে পারবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ যদি অর্থনৈতিক জীবন ইসলামের অনুশাসন ভুলে যায় তবে সেখানে পুঁজিবাদ বা অন্যকোনো চিন্তা চেতনা জায়গা করে নিবেই। এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই। কেননা দৃষ্টিগত একটা নিয়ম হলো, যেখানে ভালো থাকবে না সেখানে খারাপ ঢুকে যায়।

সারকথা হলো, পুঁজিবাদের মত বিষাক্ত অর্থনীতিকে প্রতিহত করার জন্য প্রথম করণীয় মুসলমানদের উপর বর্তায়। কেননা ইসলামের কাজ হলো শান্তি ও হকের পথ দেখিয়ে দেয়া। সে পথে চলা না চলা সম্পূর্ণরূপে তার অনুসারীদের দায়িত্ব।

আমি বলতে চাচ্ছি, ইসলামের দেয়া অর্থ ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরে থাকলে মুসলিম সমাজে কিছুতেই পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি থেকে মুসলিম সমাজ যতই দূরে যাবে পুঁজিবাদ ততোই মুসলিম সমাজে জেঁকে বসতে সাহস পাবে। কেননা ইসলামী অর্থনীতি পরিহার করার অর্থই হলো অন্যকোনো অর্থনীতিকে দাওয়াত করে মুসলিম সমাজে নিয়ে আসা।

স্বর্ণযুগেও সম্পদ ছিলো পরীক্ষা

আনতিনওলুক: একটা বাস্তবতা আমাদের সবার জানা আছে। ইসলাম যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজের লোকগুলোও টাকা পয়সা ও আয় রোজগারের সাথে জড়িয়ে গেলে আস্তে আস্তে ইসলামের অনুশাসন থেকে কেমন যেনো দূরে সরে যায়। যেমন ওসমানী শাসনামলের 'লালে যুগের' কথাই ধরা যাক। লালে যুগের দীনদার লোকগুলোও এই অবস্থার বাইরে ছিলো না। ওসমানী খেলাফতের আগের যে কোনো যুগের ক্ষেত্রেও একি কথা প্রযোজ্য। এছাড়া বর্তমানে ত সমাজে ইসলামের অস্তিত্ব থাকলেও তার অনুশাসন অনুযায়ী চলে এমন সমাজ খুব একটা পাওয়া যায় না। সমাজে ইসলামের প্রভাব নেই। জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি পুঁজিবাদের পক্ষে। তাই মুসলিম সমাজে গুঞ্জন শুনা যায়, এতকিছুর পর ইসলামের বিপ্লব কী করে সম্ভব হবে? সোনালী যুগের মানুষেরাও যখন অর্থের পাল্লায় দীন থেকে টলিয়ে গেছেন সেখানে আজকের সমাজে আমাদের অবস্থা ত আরো নাজুক হবে- এটাই স্বাভাবিক। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন থেকে আওয়াজ তুলার পরও একশ্রেণীর লোকদের কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। তারা পুঁজিবাদের পেছনেই ছুঁটছে। এহেন অবস্থায় লোক মুখে শোনা এভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করে কতদিন টিকে থাকা যাবে! তাই প্রথমেই আপনার থেকে জানতে চাই, আনুসাঙ্গিক এসব অবস্থার বিপরীতে একজন পাক্কা মুসলমান কী করে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? আগ্রাসী এই অর্থনীতির কাছে হার মানাটা কি মুমিনদের জন্য ওজর হিসেবে গণ্য হতে পারে?

ওসমান নুরী তপবাস: সাচ্চা দিলের মানুষগুলোকে ভুল পথে ধাবিত করার জন্য সব যুগে এবং সব সমাজে চেষ্টা-ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আজও তার ধারাবাহিকতা বজায় আছে। এর প্রধান কারণ হলো, মানুষকে এই জগতে পাঠানোই হয়েছে পরীক্ষার জন্য। জগতটা মুমিনের জন্য

পরীক্ষাগার। কুরআনেও সে কথার প্রমাণ রয়েছে, **"মানুষজন কি মনে করেছে 'আমি ঈমান এনেছি' বললেই পরীক্ষা ছাড়া পার পেয়ে যাবে?"** (অনকাবুত, ২)

যদি দুনিয়াকে পরীক্ষাগার হিসেবে প্রস্তুত করা না হতো আর মনুষ্য সমাজকে ভুল পথে পরিচালনা করার জন্য নেতিবাচক কোনোকিছু না থাকতো, তবে ভালো মানুষেরা তাদের উত্তম আচরনের বদলে কোনো পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারতো না। আল্লাহ এমন মাখলুকও সৃষ্টি করেছেন যাদের জীবনে কোনো পরীক্ষা নেই। যেমন ফেরাশতারা। তাদের জীবনে পরীক্ষা না থাকার কারনে তাদের কৃতকর্মের কোনো প্রতিদানও নেই।

মাহান রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জীন জাতিকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি আকর্ষণ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ও জীনদের জন্য দুই প্রকারের নেতিবাচন দিক রয়েছে। একটি বাহ্যিক অপরটি পরোক্ষ। বাহ্যিক নেতিবাচক বিষয়গুলো হলো, চারপাশের ধোঁকাবাজ চাকচিক্যময় আহবান। আর পরোক্ষ নেতিবাচক যে বিষয়টি তাদেরকে মন্দ কাজে ধাবিত করে সেটি হলো, কু-প্রবৃত্তি ও মন্দের প্রতি স্বভাবজাত টান। সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উভয়টি তাদের জন্য পেতে রাখা ষড়যন্ত্র।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> "প্রবৃত্তির বাসনায় ভরপুর দুনিয়ার চাকচিক্য মূলত আখেরাতের কষ্টের কারণ হবে। অপরদিকে পরীক্ষাসূলভ দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট আখেরাতের শান্তির কারণ হবে। (হাকিম, মুস্তাদরাক, ৪র্থ, পৃ. ৩৪৫)

যেকোনো সফলতা সেটি হাসিল করতে গিয়ে বরদাশকৃত কষ্ট অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়। যে সফলতা লাভ করা কঠিন তার মূল্য ও কদরও বেশি। একজন পিতাও সন্তানকে কষ্ট সাধ্য বিষয়ের বিপরীতে পুরস্কারের অঙ্গীকার করে। এরচে' স্পষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে! তেমনি আল্লাহ তা'আলাও পরীক্ষা নামের এই জগতে নফসের তাড়না

"যারা দীনকে ভালোবাসে তারা দুনিয়া থেকে বের হয়ে যায় না। কিন্তু দুনিয়ার প্রেমিকেরা দীন থেকে বেরিয়ে যায়।" (কালামুন কাবির)

ও শয়তানের প্ররোচনার ফাঁদে না পড়ে তাঁর দাসত্ব করার শর্তে আমাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। সঠিকভাবে তাঁর দাসত্ব করতে পারলে তিনি এই জগতেও আমাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখবেন। আর পরকালে ত আমাদের জন্য থাকবে জান্নাত ও তাঁর সুন্দর্য দর্শনের সুউচ্চ মর্যাদা। এজন্য সব যুগেই কম আর বেশ নেতিবাচক পথে ধাবিত করার আয়োজন বিদ্যমান ছিলো। আমাদের সমাজটাও এই নীতির বাইরে নয়।

বলাবাহুল্য, যেকোনো যুগের তুলনায় আজকের আধুনিক যুগে হকের পথে বাধা বহুগুনে বেশি। তাই আশা করা যায় এই যুগে যারা সকল বাধা মাড়িয়ে হকের উপর অটল অবিচল থাকবে তাদের প্রতিদানও অন্যদের থেকে স্বাভাবিক কারনেই বেশি হবে।

সুতরাং বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি কারো জন্য ওজর হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এর বিপরীতে সত্যের পথে অটল অবিচল থাকার বিশেষ ফযিলত হাসিল করার জন্য পাক্কা মুসলিমদের দায়িত্ব হলো, শত্রুর মোকাবেলায় পরাজয় বরণ না করে সদা সর্বদা হকের পক্ষে লড়ে যাওয়া। বলাবাহুল্য, বাতিলের বিরুদ্ধে মুজাদালা তাকওয়ার শক্তির মাধ্যমে হতে পারে। তাই প্রতিটি মুমিনকে সব কিছুর আগে খাঁটি একজন মুত্তাকি হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো, তাকওয়া কী? সহজে বলতে গেলে তাকওয়া হলো, প্রবৃত্তির বাসনাকে দমিয়ে রাখা, আধ্যাত্মিক সুপ্ত শাক্তিকে জাগিয়ে তোলা, সদা সর্বদা আল্লাহর নজরদারির বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও এই মানসিকতা সৃষ্টি করা যে, আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম রেকর্ড করে রাখছেন। আখেরি যামানার ভয়াবহ ফেতনা থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রতিটা মুমিনকে নিশ্চয় তাকওয়া নামের এই লৌহবর্ম পরিধান করতে

হবে। তাকওয়ার পোষাক ছাড়া সেসব ফেতনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না। বর্তমান যুগে উপার্জনের উৎস হলো, তাকওয়ার পরিচয় দেয়ার প্রধান সেক্টর। উপার্জিত সম্পদ কোন্ পথে আসে আর কোন্ পথে সম্পদ ব্যয় করা হয়- এই দিকটি বিবেচনা করেই সহজে একজন মুত্তাকিকে ওজন করা যায়। কেননা আমাদের এই যুগে বানিজ্যিক সেক্টরে অবৈধ লেনদেনের প্রচলন বেশি হওয়ার কারণে এমনকি কিছু কিছু হারামকে হালাল মনে করার কারণে এই সেক্টরে তাকওয়ার পরিচয় দিতে পারা অনেক বড় সফলতা ও আল্লাহর আনুগত্যে পরিচয় বহন করে।

তাকওয়াবান মুমিন সর্বদা বিশ্বাস রাখে তার মালিকাধীন সবকিছু আল্লাহর দান। তার যাবতীয় পুঁজি আল্লাহর বিশেষ করুণা। এসবই তকদীরের ফায়সালা। এমন বিশ্বাসের কারণে সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সম্পদের প্রাচুর্যে অহংকারে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহর সামনে নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দেয়।

প্রকৃত অর্থেই আয় রোজগারের বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যের সাথে মিলিত। আশপাশে এমন অনেককে দেখবেন অনেক বেশি আয় রোজগার করার ধান্ধা করে না, ব্যবসা নিয়ে খুব একটা পড়ে থাকে না, যা পায় তা দিয়েই একরকম জীবন চালায়। কিন্তু তার একটা পতিত জমিন ছিলো। কোনো কারণে ঐ জমির পাশে বাজার গড়ে উঠেছে। কিংবা ওর জমিনের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেছে। মূহুর্তেই দেখবেন সে অনেক বড় ধনী হয়ে গেছে। এর বিপরীতে এমন কিছু লোকও দেখবেন যারা দুই পয়সা উপার্জন করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। সারা দিন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে মেতে থাকে। ব্যবসার সকল কল কব্জা তার জানা আছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও তার ভাগ্যে তেমন একটা আয় রোজকার করার সুযোগ হয় না। সেজন্যই সমাজে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে বলা হয় সে এতই ভাগ্যবান যে "মাটি ধরলে সোনা হয়ে যায়"; আবার কিছু লোকের ক্ষেত্রে তার উল্টোটাও বলা হয়, "স্বর্ণ হাতে নিলে বালু হয়ে যায়।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"মানুষ এমন এক মাখলুক যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে (পরীক্ষার বিষয়টি বেমা'লুম ভুলে গিয়ে) বলে, আল্লাহ আমাকে সম্মান দান করেছেন।"**(ফজর, ১৫)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, **"আর যখন মানুষকে পরীক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহ তার রিযিক কমিয়ে দেন (তখন সে কষ্ট পায়। এবং বলে) আল্লাহ আমাকে অপদস্ত করেছেন।"** (ফজর, ১৬)

অথচ কারো ধনাঢ্যতা তার জন্য কল্যাণকর নাকি ক্ষতির কারণ সেটা বলা যায় না। সেটা কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। এজন্যই সত্যিকারের মুমিন সম্পদ অর্জন করতে পারলে খুশিতে নেচে উঠে না; আবার কোনো কিছু হাত ছাড়া হয়ে গেলে দুঃখে ভেঙ্গেও পড়ে না। সর্বাবস্থায় সে আলহামদুলিল্লাহ বলে। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই সে সবসময় গুরুত্ব দেয়। কারণ তার জানা আছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার প্রধান দু'টি শর্ত আছে। এক নম্বর আল্লাহর কৃত ফায়সালায় সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ কানা'আত বা অল্পে তুষ্ট থাকা।

> "পরীক্ষা হিসেবে আল্লাহ যাকে চান অসংখ্য নেয়ামত দান করেন; যাকে ইচ্ছা কম দেন। নিঃসন্দেহে তিনি বান্দার সবকিছু জানেন। তিনি তাদের সবকিছু দেখেন। (ইসরা, ৩০)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যা কিছুই দিন না দিন বান্দা সবসময় কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে। 'কেনো অমুককে দিলেন আর আমাকে দিলেন না' এমন প্রশ্ন তার মাথায় আসতে দেবে না। সুখ দুঃখের জীবনই হলো, দুনিয়ার জীবন। দুঃখের হালতে ধৈর্য্যের পরিচয় দিবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রকৃত জীবন ত আখেরাতের জীবন' বক্তব্য থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে এই দুনিয়ায় ওভাবেই গঠন করবে।

নেয়ামতপ্রাপ্ত হলে আল্লাহর শুকরিয়ায় লিপ্ত থাকা আর এর বিপরীতে নেয়ামত থেকে মাহরুম হলে আল্লাহর নির্ধারণ করা তকদীরের

ফায়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাকে কিছুতেই প্রকৃত আনুগত্য বলা যাবে না। অবশ্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে দূর্বল হলে সহজে কোনো মুসলমান প্রকৃত অর্থে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হতে পারে না। মানবিক দূর্বলতা থেকে বাঁচতে তাকে প্রথমে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। কেবল তখনি ভালো মন্দ যাই হোক সর্বাবস্থায় শুকরিয়া আদায় করার মত অবস্থা একজন মুমিনের অন্তরে তৈরী হয়। এমন পরিপূর্ণ মুমিনদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **"হে প্রশান্ত মন, তোমার রবের কাছে ফিরে যাও। তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট; তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার নেককার বান্দাদের দলে মিশে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।** (ফজর, ২৭-৩০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

রূপা ও স্বর্ণের দাস এবং অহংকার বহনকারী পোশাকের পেছনে যারা পড়ে থাকে তাদের ধ্বংস হোক। এমন স্বার্থপর লোকদেরকে যদি সমস্ত চাওয়া পূরণ করে দেয়াও হয় তবে সে খুশি হয়। আর কোনো কারণে তাকে মাহরুম করা হয় তবে সে আল্লাহর বণ্টনের বিরোধীতা করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।" (বুখারী, রিকাক, ১০, জিহাদ, ৭০; ইবনু মাজাহ, যুহ্দ, ৮)

দূর্বলতা কি ওজর?

আলতিনওলুক: পুঁজিবাদ আজ সবখানে ছড়িয়ে গেছে। পুঁজিবাদের জয়জয়কারের আজকের দিনে কুরআনের ভাষায় "মুস্তায'আফ বা দূর্বল মুসলমানের"-এর আওতায় কি আমরা পড়বো। একজন মুসলমানকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মা'জুর হিসেবে বিবেচনা করা হবে?

ওসমান নূরী তপবাস: আজকের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে দূর্বল বলে ওজরের আওতায় গন্য করা যাবে না। কারণ সাহাবাদের যুগের মুসলিম সমাজ খুব বেশি ধনাঢ্য ছিলো না। বরং মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে সচেষ্ট আশপাশের মুশরিক ও অমুসলিম জাতিগুলো মুসলিমদের চে' ধনে ও বলে শক্তিশালী ছিলো। তবুও ইতিহাস সাক্ষী সে সমাজের মুসলমানগণ বেদীনদের মত ধনে বলে শক্তিশালী হওয়ার জন্য সুদ ঘুষ ও অন্য যেকোনো অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনে লিপ্ত হন নি। এমনকি এধরণের অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার কল্পনাও তাদের মনে জাগে নি। প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতার মালিক আল্লাহ- এ কথায় মনে প্রাণে তারা ঈমান রেখেছিলেন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে বৈধ পন্থায় তারা চেষ্ট তদবীর চালিয়ে গিয়েছেন। ফলে তারা আপন প্রচেষ্টায় কল্পনাতীত সফলতাও লাভ করেছিলেন। ইতিহাস ত বলে, ইসলামের ইতিহাসের বড় বড় জয়গুলো সাহাবাদের যুগেই অর্জিত হয়েছিলো। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আধ্যাত্মিক শাক্তির সাথে জাগতিক শক্তি কোনো সময়ই কুলিয়ে উঠতে পারে না। কুরআনের আয়াত বলছে- **"সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও বহু দল আল্লাহর কুতরতে সংখ্যায় অধিক অনেক দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"** (বাকারা, ২৪৯)

সূরা ফাতিহার পাঁচ নং আয়াতে আমরা বারবার পড়ি, "(হে আমাদের রব!) আমরা শুধুমাত্র তোমার ইবাদত করি আর তোমার কাছেই শুধু সাহায্য চাই। এই আয়াতটির দাবিও হলো, আমরা যে

পরিমাণ আল্লাহর দাসত্ব করবো সেই পরিমাণেই তাঁর সাহায্য আমাদের নসীব হবে।

> যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে (সে অনুযায়ী আমল করে), নামায (মন দিল লাগিয়ে) আদায় করে, আমি যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে (আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায়) গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে তারা এমন এক লাভের আশা রাখে যাতে কিছুতেই লোকসানের আশঙ্কা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের সওয়াব পুরোপুরি দিয়ে দেবেন এবং অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। (ফাতির, ২৯-৩০)

মানবসন্তান মায়ের পেট থেকে কিছুই শিখে আসে না, দুনিয়ার জীবনে সব ক্ষেত্রে সে শিক্ষার মুখাপেক্ষী। সে জন্যই জাহিলিয়্যাহ তথা মূর্খতার যুগগুলোতে নবীদেরকে উত্তম শিক্ষকের যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগত সমাজটি ছিলো জাহিলিয়্যাতের শীর্ষে। এরচে' অন্ধকার যুগ মানব ইতিহাসে আরেকটি নেই। সে যুগের অর্থনৈতিক রূপরেখা আজকের পুঁজিবাদের চেয়েও বহুগুণে মারাত্মক ছিলো। মানবতার সব শিক্ষা সে সমাজে ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। মানবতা শূণ্যের কোঠায় নেমে গিয়েছিলো। দয়া মায়ার ছিঁটেফোঁটাও ছিলো না। সে সামজেও দু' শ্রেণীর মানুষ বাস করতো- ধনী ও গরীব। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুঁজিবাদের চেয়েও নিম্নমানের অর্থনীতিকে কীভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢেলে সাজিয়েছিলেন? কী এমন শিক্ষা তিনি জাহিলিয়্যাহ যুগের মানুষগুলোকে দিয়েছিলেন যে, আজ পর্যন্ত তাদের মত স্বর্ণমানব পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় নি, আবার কোনো যুগে আসবে সে কথাও বলা দায়?হাবশার ওয়াহশি কী করে হযরত ওয়াহশী রাদি. হয়েছিলেন? মায়ের কোল থেকে কন্যা শিশুদের কেড়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতেও যাদের মন কাঁপতো না এমন কোন্ শিক্ষার ছোঁয়ায় সামান্য কিছুতেই তাদের চোখে পানি এসে যেতো, অন্তরগুলো নরম ও অন্যের কষ্টে কেঁদে উঠতো? মূলত আমাদের এদিকেই লক্ষ্য করা দরকার।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মত অতীত যুগে আরো বহু 'তন্ত্রমন্ত্র' গত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাকওয়ার লৌহবর্ম

আলতিনওলুক: লোকজন বলে থাকে, আজকাল সমাজে অপরাধের খুব শক্ত এক কাঠামো গড়ে তুলা হয়েছে। ভুল হলেও এই কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কোনো পদ্ধতিতে সমাজটাকে গড়া খুব কঠিন। এমতাবস্থায় সর্বব্যাপী সমাজের এই ভয়ংকর থাবা থেকে খাঁটি লোকগুলো নিজেদের কী করে রক্ষা করবে?

ওসমান নূরী তপবাস: প্রশ্নকৃত ভয়াবহ আগ্রাসী থাবা থেকে একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মুমিনের অন্তরের আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা আমাদের সবচে' বড় হাতিয়ার। কারণ জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার ফলপ্রসু ও কার্যকরী হাতিয়ার হলো তাকওয়া। ক্ষণস্থায়ী ও লয়শীল এই জগতের খেল তামাশার মোহে চিরস্থায়ী ও অনন্ত সুখের ঠিকানা আখেরাতকে বিনষ্ট করার মত নির্বোধ কোনো মুমিন হতে পারে না। তিন দিনের দুনিয়ায় খায়েশ ও চাহিদা মেটানোর নামে আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করার চে' প্রয়োজনে একজন মুমিন অবৈধ চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকবে। জিয়া পাশার ভাষায়:

> "কোনো দেশে নীচু পর্যায়ের লোকগুলো যদি ছায়া দিতে শুরু করে অর্থাৎ সমাজের সর্বত্র তাদের ক্ষমতা চলে তবে বুঝতে হবে সে দেশের আকাশে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় হয়েছে অর্থাৎ বিপদের সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

মানুষ সততা বজায় রাখবে যতই আসুক বিপদ
আল্লাহ স্বয়ং সততার পথকে রাখেন নিরাপদ

অর্থাৎ খাঁটি মুমিনকে কখনো কখনো তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা রক্ষার্থে ও আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির হেফাযত করণার্থে অর্থনৈতিক দিক

থেকে পিছুটানও দিতে হতে পারে। আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার শংকা হলে সে টাকা পয়সা হাতছাড়া করতেও কুণ্ঠিত হবে না। নিজের অধিকার থেকে দাবি উঠিয়ে নিলেও তার আসা থাকবে এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে। এই ভেবে সে হাতছাড়া সম্পদের জন্য ভেঙ্গে পড়বে না। নিজেকে এর মাধ্যমেই সান্ত্বনা দেবে। এবং ক্ষতি সাধন হলেও হাসিখুসি থাকবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহ আমাদেরকে জীবনের সব দিকগুলোর বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ করা সত্ত্বেও তাঁর একটা আদেশও এমন পাওয়া যাবে না যাতে তিনি বলেছেন, "হে মুসলমানরা তোমাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বি হতে হবে।" তবে হ্যাঁ আমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হলো, "হালাল পথে সম্পদ অর্জন করো, হালালের মধ্যে থেকো সদা সর্বদা, হালাল পথে অর্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো"। আমাদের প্রতি তার নির্দেশ এটাই যে, আমরা সবসময় সতের পথে, হালালের মধ্যে থাকবো। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, যত কঠিনই হোক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হালালের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলা ও জীবনটাকে হালাল পথে পরিচালিত করা। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত করা সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করা উচিৎ হবে না। কেননা শত চেষ্টা করেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্পদের অতিরিক্ত

"হে হুকুমদার রাজা বাদশাহ, দেশের পর দেশ যদি তুমি জয় করার ইচ্ছে লালন করো তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তুমি এই তিনটি কাজে সতর্কতা অবলম্বন করো:

১. আল্লাহর রাহে বেরিয়ে জুলুমকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য তোমার ডান হাতে তরবারি উন্মোক্ত রাখো।

২. পাশাপাশি অপর হাতে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান সদকার ঝুলি তুলে নাও।

৩. তোমার মুখের ভাষা যেনো মিষ্টি মধুর হয়।

এভাবেই ছোট বড় শক্তিধর দুর্বল সবাই তোমার বশে চলে আসবে।

(ইউসুফ হাস হাজিব, কুতাদগু বিলিগ)

কিছুই অর্জন করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। সুতরাং আল্লাহর বণ্টনের উপর সন্তুষ্টি করে হালাল পথে অর্জিত সম্পদ থেকে সঠিক পথে ব্যয় করার বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী। জাগতিক সামান্য কিছু সুখের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক ও অন্তরের প্রশান্তিকে বিসর্জন দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। ইসলামের পথে চললে মনের যে প্রশান্তি আসে সেটাকে দুনিয়ার মোহে পড়ে নষ্ট করে দেয়া বোকামী। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ইসলামের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তিকেই ধনী সাব্যস্ত করা হয় যে নাকি মনের দিক থেকে ধনী। অর্থ্যাৎ যাই আছে না আছে তা থেকেই অন্যকে দেয়ার মত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারীই প্রকৃত ধনী।

ধনাঢ্যতা কি মুসলমানিত্ব কেড়ে নেয়?

আলতিনওলুক: মুসলমানদের মাঝে ভেতর ও বাহির থেকে একটি বিষয়ে খুব করে আলোচনা সমালোচনা চলছে। বলা হয়, "মুসলমান ধনী হওয়ার পর হায়াতের সঠিক মানদণ্ড হারিয়ে ফেলে, স্বার্থ সিদ্ধির সকল পথকে বৈধ ভাবতে শুরু করে, টাকা মুসলমানের মুসলমানিত্ব কেড়ে নেয়, ইহ জগতের প্রতি বিশেষ আগ্রহের ভাইরাস সমাজের ধনী মুসলমানদের অন্তরেও প্রবেশ করতে শুরু করেছে"। উপর্যুক্ত এসব বিষয়কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উসমান নূরী তপবাস: যে যুগে মুসলমানরা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং ইসলামের সকল চাওয়া নিজেদের জীবনে ফিট করেছিলেন- সে যুগের কর্মপদ্ধতিই উপরে আলোচিত ভেতরগত সমালোচনাগুলো সবচে' স্পষ্ট উত্তর হবে বলে আমার কাছে মনে হয়। যদি উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে উমর ইবনু আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আড়াই বছরের শাসনকাল ও উসমানী শাসনামলের প্রথম তিনটি শতাব্দির দিকে লক্ষ্য করুন। ঐ সময়টাতে উপরে উল্লেখিত সমালোচনাগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে। দেখবেন আলোচ্য দু'টি স্বর্ণ যুগে মুসলমানদের হাতে দুনিয়ার ধনভাণ্ডার জমা ছিলো। কিন্তু তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়ের গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে সেসব যুগের মুসলমানরা দুনিয়াদার বনে যায় নি। ধনীরা সম্পদের দাপটে গরীবদের উপর কঠোরতা করে নি, কৃপণতাকে সমাজে স্থান দেয়া হয় নি; বরং অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, সমাজে যাকাত নেয়ার মত কোনো গরীব তালাশ করেও পাওয়া যেত না।

মুসলিমদের ব্যাপারে বাইরে থেকে যেসব সমালোচনা করা হয় সেগুলোর উত্তরও আমরা উসমানী শাসনের শেষের তিনটি শতাব্দিতে পাই। এই তিনটি শতাব্দি থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। শতাব্দি

তিনটি আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার মানসিকতা যখন দূর্বল হয়ে যায়, দুনিয়ার চাকচিক্যের ভালোবাসায় যখন মুসলমানরা মত্ত হয়ে যায়- তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া সমস্ত নেয়ামত, বরকত ও শাসনের আমানতকে সেসব মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নেন।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর বিশেষ কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সেগুলো হলো, তারা এই দুনিয়ায় আল্লাহ পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হবে, ইলাহী বাস্তবতাকে নিজেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করবে, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা চালাবে এবং নিজেদের জীবনে ইসলামের সকল আদেশ বাস্তবায়ন করে আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসারে ভূমিকা রাখবে। আল্লাহর দেয়া এসব গুরু দায়িত্ব মুসলমানরা যতদিন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে ততোদিন তারা সমাজিক ধ্বসে ও অর্থনৈতিক চাপে পড়বে না। এমন সমাজে যদি বাহ্যিকভাবে কোনো ধরণের অভাব অনটন দেখাও দেয় তবুও সমাজে শান্তি নিরাপত্তা ও সামাজিক ভাঙ্গন কিছুতেই দেখা দেবে না। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে লিপ্ত সমাজের লোকগুলো শত কষ্টের মাঝেও একতা ও শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

> ঈমানের সবচে বড় ফল হলো দয়া। দয়া দেখানোর সর্বোত্তম পন্থা হলো, তোমার কাছে যে নেয়ামত আছে তা থেকে বঞ্চিতদের মাঝে সে নেয়ামত বিলিয়ে দেয়া।

উসমানী খেলাফতের শেষ যামানায় মধ্যপ্রাচ্যে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আলিয়া কাদুরির লিখিত কিতাবে লেখক যে তত্ত্ব দিয়েছেন সে মতে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে মধ্য আনদোলুতে ভয়ংকর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিলো। ইংরেজরা খাদ্যাভাবের সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে উসমানীদের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানী দেয় এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্যন্ত শুরু করিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ঐ সময়টায় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে

অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছিলো। গোয়েন্দারা যে তত্ত্ব দিয়ে গিয়েছিলো তা খুবি শিক্ষনীয়।কোনো এক সাক্ষাৎকারে তারা রিপোর্ট করেছিলো-

"আনদোলুতে খাদ্যের অভাব আছে কিন্তু অনাহারি নেই"! কেননা সমাজের প্রতিটি লোক অন্যের খোঁজ খবর নেয়। অন্যকে সাহায্যে সবাই দৌড়ে যায়। তাই খুব বেশি আহার্য্য এই অঞ্চলে না থাকলেও কেউ ক্ষুধার্ত থাকে না। সুতরাং অন্যের সাহায্যে নিবেদিত এমন সমাজের লোকদের দ্বারা উসমানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগানো আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না!..."

দ্যা লে মোতরায় ভাষায়:

"উসমানী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভূক্ত কোনো একটি দেশের সকল বাড়ি ঘর যদি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং নিকটজনদের যদি বন্দি করে দাসত্বের জীবন বরণ করানো হয় তবুও উসমানী সমাজে অন্যান্য সমাজের মত নারীদের আহাজারি ও বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনা সম্ভব হবে না। সর্বস্ব হারানো মুসলমানের মনে আল্লাহর প্রতি যে নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ

হযরত আলী রাদিআল্লাহু বলেন, দু'টি নেয়ামত এমন আছে সে দু'টির কোনটিকে আমি বেশি ভালোবাসি তা আজও নির্ণয় করতে পারলাম না।

১. মুখাপেক্ষী কোনো ব্যক্তির আমার কাছে হাজির হওয়া। সে আমার কাছে আন্তরিকতার সাথে এই আশা নিয়ে কিছু চাইবে যে, আমি তাকে সহযোগিতা করবো।

২. আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তাঁর কোনো বান্দার কোনো প্রয়োজন মেটাবেন। কিংবা তাঁর বান্দার কাছে নেয়ামত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাকে মধ্যস্থতা বানাবেন। একজন মুসলমানের প্রয়োজন মেটানো ও সমস্যার সমাধান করা আমার জন্য দুনিয়ভর্তি স্বর্ণ রৌপ্য থেকেও উত্তম।

(আলী আল মুত্তাকী, ৬ষ্ঠ, ৫৯৮/১৭০৪৯)

তা ভাষায় বুঝানো সম্ভব হবে না। না দেখলে এমন আত্মসমর্পণের কথা লিখে বুঝানো যাবে না। এছাড়া অন্যের কষ্টে দরদী সমাজের লোকগুলো দান সদকাকে খুব বেশি ভালোবাসে। যার ঘর পুড়ে যাবে তাকে সাহায্যের জন্য সবাই এগিয়ে আসবে। মূহুর্তেই দেখা যাবে পুড়ে যাওয়া ঘরের মত নতুন আরেকটি ঘর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনোও ত আগের থেকেও আরো উন্নত ঘর বানিয়ে দেবে।"

করনিল্লি লে ব্রুইন নিজের অভিজ্ঞতার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন:

"ইয়াহুদী হোক অন্য কোনো জাতি- সবার থেকেই যে তুর্কী জাতি দান খয়রাত ও অভাবীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে আছে তা অস্বীকার করা কোনো সুযোগ নেই। উসমানী শাসনের অধীনে দেশগুলোর রাস্তাঘাটে তেমন কোনো ফকীর মিসকিন দেখা যায় না, ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করতে আসতে হয় না- এসবের কারণও অভাবীদের সাহায্যে তুর্কীদের এগিয়ে আসা। তারা দোরগোড়ায় গিয়ে অভাবিদের অভাব মিটিয়ে দিয়ে আসে..."

উল্লেখিত এই কয়টা আমাদের পূর্বপুরুষদের উদারতার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। উসমানী সমাজের দান সদকার মূলে ছিলো সাহাবাদের স্বর্ণ যুগের শিক্ষা। সাহাবারা ইসলামের প্রাথমিকগুলোতে খুব অভাবে থাকতেন। তবুও সে সমাজের কোনো অংশে অশান্তি ও দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। সমাজের সবাই মিলে মিশে বাস করতো। মনের প্রশান্তি ছিলো সে সমাজে। কিন্তু বর্তমানে জাগতিক ধন ভাণ্ডারে ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও সমাজে শান্তির পায়রাটাকে উড়তে দেখা যায় না। মনের প্রশান্তি নেই। মানসিক দুঃচিন্তার শেষ নেই। শত সমস্যায় জর্জরিত আজকের সমাজ। কেননা 'খাই খাই মানসিকতা' ও 'আরো চাই, আরো চাই'-এর ব্যধির কারণে ধনীদের স্বভাব হিংস্রতায় রূপ নিচ্ছে, তারা জন্তু জানোয়ারের মত নিজের স্বার্থ লাভের জন্য বেপরোয়া উয়ে পড়ছে, অভাবীর দুঃখকে ভাগাভাগি করে নেয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলস্বরূপ কৃপণতা সমাজের মাথায় জেঁকে বসেছে।

ইমাম খতীব মাদরাসায় পড়াকালে উস্তাদ নুরুদ্দীন তপছো আমাদেরকে মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করতেন:

"আজকের লোকগুলো বেশি ভাগ্যবান নাকি বিগত সমাজের লোকগুলো বেশি ভাগ্যবান ছিলো?"

প্রশ্ন করার পর তিনি নিজেই উত্তর দিতেন। একে একে ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে দেখাতেন বর্তমানের মানুষজন কত ধরণের সমস্যায় জর্জরিত আছে আর আগের যুগের লোকজন কী পরিমাণ শান্তি ও নিরাপত্তায় ছিলো।

এজন্যই মানুষ যে যুগে আর যে সমাজেই থাকুক না কেন, ইসলামের সীমারেখা মেনে নেয়ার সাথেই তার ইহকাল ও পরকালের শান্তির সম্পর্ক...

মানুষের অন্তর দুনিয়ার লোভে পড়ে গেলে আখেরাতকে ভুলে যায়। শত তালবাহানা করে অন্যায় পথে আয় রোজগারে লেগে যায়। তার সামনে তখন আর হক বাতিল ও ন্যায় অন্যায়ের কোনো সীমা রেখা থাকে না। এই বাস্তবতা উপলব্দি করতে আজকাল খুব বেশি

হযরত আবু বকর রাদি. বলেন,

"ঈমান যদি মসজিদে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ লেনদেন ও আচরনের ঈমানের প্রভাব না থাকে; সম্পদ যদি কৃপণদের হাতে গচ্ছিত থাকে; অস্ত্র যদি ভীতুদের হাতে শোভা পায়; ক্ষমতা যদি দূর্বলদের হাতে চলে যায়- মূলত তখনই দুনিয়া অচল হওয়ার পালা।"

বেগ হতে হবে না। আশপাশের লোকগুলোর দিকে নজর দিলেই এই বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বর্তমানে শক্তি ক্ষমতা ও স্বার্থের নামে যে জুলুম চলছে পুরো পৃথিবী জুড়ে- মানবতা কি তা আদও মেনে নেয়? একটা বোমা ফাটানো হলে গাছ গাছালি, জন্তু জানোয়ার, বাচ্চা কাচ্চা, বৃদ্ধ শিশু, সুস্থ অসুস্থ- সবার প্রাণ মূহুর্তেই কেড়ে নেয়। কোথায় আজ দয়া, কোথায় আছে মানবতা! নিরঅপরাধ মাজলুমদের রক্তের উপর দিয়ে ভেসে আসা অর্থ কোন ধরণের মানবতার সমাজ গড়ে তোলা হবে?

মোট কথা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য থেকে দূরে থাকা পুঁজিবাদী মানসিকতা ব্যক্তিকে সম্পদের মোহে ফেলে দেয়। একপর্যায়ে তাদেরকে টাকা পয়সার দাসে পরিণত করে।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী অবস্থান

আলতিনওলুক: পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী গ্রহনযোগ্য একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। একসময় এই পুঁজিবাদ সমাজবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহন করছে। সমাজবাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে পুঁজিবাদ। সমাজবাদ টিকে থাকতে না পেরে রাশিয়া ইউনিয়ন ও চীন থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদকে বিজয়ী মনে করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও বলতে শুনা যায়: পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কোনো শক্তি ও সিস্টেম যদি থাকে সেটা নিশ্চয় ইসলাম। ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শক্তি নাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কারণ ইসলামের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়া ও আখেরাতকে বেষ্টনকারী। এবং সেটা খুব স্পষ্ট। আর বাস্তবেও সুস্পষ্টভাবে ও দুনিয়াসহ আখেরাতের সফলতার কথা বলে এমন একটা সিস্টেমের প্রতি বর্তমান দুনিয়া মুহতায। ফলে বহু সময় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অনেককে অবস্থান গ্রহন করতে দেখা যায়। উদাহরণ ওয়েল স্ট্রেটকে ঘেরাও করা ও নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা যায় অনেককে। এই বিষয়ে ইউরোপীয় জগতও চুপ নেই। তারাও খুব তৎপর এই নিয়ে। সবশেষে তুরস্কেও পহেলা মে পালিত হতে শুরু করেছে। পুঁজিবাদঘেষা একদল মুসলমান বামপন্থীদের সাথে মিলে মিশে চলতে আরম্ভ করেছে। জানার বিষয় হলো, পুঁজিবাদের বিষাক্ত এই থাবার বিরুদ্ধে গঠনমূলক কোনো সমালোচনা ও পুঁজিবাদের চেয়েও সুগঠিত কোনো অর্থব্যবস্থা কি সমাজের লোকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে না? উদাহরণস্বরূপ আবু যারের দেখানো পদ্ধতিটা কি এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে?

উসমান নূরী তপবাস: প্রথমে যে বিষয়টি আমাদের মনে বদ্ধমূল রাখা দরকার সেটি হলো, হক ও বাতিল এক কাতারে কোনো সময় দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং বাতিলের সাথে ইসলামের মিশ্রণ কোনো সময়ই সম্ভব হবে না। কমিউনিজমের দৃষ্টিতে মালিকানা সমাজের।

ঐক্যবদ্ধভাবে সে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সবাই রাখে। উৎপাদন ও ব্যবহার দু'টোই সমষ্টিগতভাবে সমাজের কাজ। ব্যক্তিমালিকানা কমিউনিজম স্বীকার করে না। এর বিপরীতে পুঁজিবাদ ব্যক্তিমালানাকে স্বীকৃতি দেয়। যাবতীয় সম্পদের মালিক ব্যক্তি; সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। প্রকৃতপক্ষে দু'টো থিওরীর এক জায়গায় মিল রয়েছে। সেটি হলো, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম সম্পদের মালিকানা নিয়ে কথা বলে। এবং এর একটি আরেকটির বিপরীত। একটি মালিকানা সমাজের হাতে অর্পণ করলেও অপরটি ব্যক্তিমালিকানার প্রবক্তা। সম্পদের মালিকানা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে এই দু'টির বাইরে ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি মত প্রকাশ করে। ইসলামের মতে **"মালিকানা ব্যক্তির না, সমাজেরও নাঃ প্রকৃত মালিকানা কেবলমাত্র সম্পদের স্রষ্টা আল্লাহর জন্য স্বীকৃত"**। এজন্যই পেছনে বলে এসেছি, ইসলামে সাথে অন্যান্য থিওরীগুলাকে মেশানো কিছুতেই সম্ভব হবে না।

শেখ সা'দী রাহ. বলেন,
"পেটের দরদ যদি না থাকতো তবে কোনো পাখি শিকারির ফাঁদে পা রাখতো না।"

ইসলামের গ্রহনযোগ্যতা ও অদ্বিতীয়তার সৌন্দর্যের উৎস এখানেই। এখান থেকে ওখান থেকে ধার নিয়ে জোরা তালি দেয়ার প্রয়োজন ইসলাম অনুভব করে না। এর পরেও যদি কেউ ইসলামকে অন্যান্য সিস্টেম ও থিওরীর সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে পরিমার্জন করার দুঃসাহস করে তবে বুঝতে হবে এটা তারই নির্বুদ্ধিতাও দূর্বলতা। তার এই ধরণের মানসিকতার স্পষ্ট কারণ হলো, সে ইসলামকে ভালমত আত্মস্থ করতে পারে নি।

মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এধরণের আহমকের বিষয়ে দারুণ একটি উদাহরণ পেশ করে গেছেন: আল্লাহ তা'আলা মাছদের রিজিক স্থলে রাখেন নি। গভীর থেকে গভীর পানির নীচেও আল্লাহ তা'আলা মাছদের রিজিকের সুষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর পরেও

দেখা যায় পানিতে থাকা মাছগুলো স্থলের খাবারের প্রতি খুবি আগ্রহী। পানিতে থেকে তারা স্থলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে আসা খাবার পেলে খুব আগ্রহ ভরে মুখে উঠিয়ে নেয়। ছিপের পুরোটা অংশ ত আহমক মাছ দেখতে পায় না। তাই বারশির মাথায় দেয়া সামান্য খাবারের লোভে সে এগিয়ে যায়। পানিতে কিন্তু মাছের খাবারের অভাব নেই। কিন্তু লোভে বাহ্যিকভাবে খাবারের মত দেখে সে বরশিটাকে নিজের মুখে পুড়ে দেয়। আর এভাবেই নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করে। নিজের মুখে খাবারের উঠাতে গিয়ে সে নিজেই অন্যের মুখের খাবারে পরিণত হয়।

ইমাম শাফেঈ রাহ. বলেন,

"দুনিয়াদার ব্যক্তির সোহবত ও সঙ্গ সুস্থ মানসিকতার অধিকারী দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে।"

ইমাম গাযালী রাহ. বলেন,

"চিন্তা চেতনায় অমুসলিমদের সাথে সখ্যতা রাখলে তা একসময় অন্তরে প্রভাব ফেলে। অন্তরে সৃষ্ট এই প্রভাবের ফলে ঈমানদারের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়।"

ইসলামকে ঢেলে সাজানোর নাম করে জাগতিক অন্যান্য থিওরীগুলোতে ধার করা কিছু মতবাদ ইসলামে অনুপ্রবেশ করাতে চাওয়া মানে নিজের দূর্বলতা ও অপরগতা প্রকাশ করা। কেননা ইসলামই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। যার উৎস মানুষ ও সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত থিওরীর মধ্যে মানবিক থিওরী থেকে ধার নিয়ে কোনো কিছু জোড়া লাগিয়ে দেয়ার যৌক্তিক কোনো দিক থাকতে পারে না। এমনকি ইসলাম ইলাহী জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে মানবিক তন্ত্রমন্ত্রের সাথে ইসলামের তুলনা করাও ঠিক হবে না। এছাড়া কেউ ইসলামী ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে সেই ত্রুটি দূর করতে গেলে দেখা যাবে সে নিজেই আরো এক শ' টা ভুলের মধ্যে পতিত হবে। তার ওসব ভুলচুকও ইসলামে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তখন ইসলাম আর ইলাহী স্বকীয়তা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না; হয় ইসলামী ব্যবস্থাকেও পুঁজিবাদের দিকে ধাবিত করা হবে কিংবা কমিউনিজম ঘেঁষা নতুন কোনো থিওরী হয়ে যাবে। ইসলাম আর

ইসলাম থাকবে না। এভাবে ইসলাম যখন স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে তখন তার অনুসারীরাও ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও বিশেষত্ব হারিয়ে বসবে।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ ইস্তাম্বুল বিজয় করার পর শহরটাকে নতুন করে রূপ দেয়ার প্রয়োজন পড়েছিলো। কিন্তু তেমন কিছু সাজ সজ্জা করানো হয় নি ইস্তাম্বুলকে। একসময় মসনদে আসে দ্বিতীয় বায়েজিদ। একই প্রয়োজন তখনো অনুভূত হচ্ছিলো। এমন সময় লেওনারদো দ্য ভিনজি নামের জগত বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পী সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদের কাছে চিঠি লিখে, **"ইস্তাম্বুলের মসজিদ, ঝর্ণা, নহর ও রাস্তা ঘাটের প্লান প্রোগ্রামটা আমি করে দিতে পারবো।"**

দ্য ভিনজির এই প্রস্তাব রাজ প্রাসাদের অনেকের মনে ধরেছিলো। তারা দ্য ভিনজির প্রস্তাবে রাজিও ছিলো। তারা মনে করছিলো দুনিয়া কাঁপানো একজন স্থাপত্য শিল্পী দ্বারা ইস্তাম্বুলকে নতুন করে সাজানো হবে- এতো উপযুক্ত বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তির প্রস্তাব। এই ভেবে তারা খুশি মনে দ্য ভিনজিকে অনুমতি দিতে চাইলো।

কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ খান দ্য ভিনজির এই প্রস্তাব গ্রহন করেন নি; নাকচ করে দেন। চিঠিতে প্রস্তাবের নেতিবাচক দিকটি এভাবে তুলে ধরেন, "দ্য ভিনজি! তুমি এসে হয়তো ভালো কোনো প্লান আমাদের উপহার দিতে পারবে। কিন্তু তোমার করা প্লানে কোনো আধ্যাত্মিকতা থাকবে না। তোমার প্লানও আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না।"

এরপর রাজ প্রাসাদের যারা দ্য ভিনজির প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করছিলো তাদের লক্ষ্য করে সুলতান বললেন, "আমাদের স্থাপনাকে আমাদের মত করে নিজেরাই গড়ে উঠাবো। সে জন্য অন্যকে ধর্ণা দিতে যাবো না। সুতরাং দ্য ভিনজি যদি পাখি হয়ে ইস্তাম্বুলের আকশে উড়তে আসে সে অনুমতিও তাকে দেয়া যাবে না।"

এভাবেই সর্বশেষ খেলাফত ব্যবস্থার রাজধানী ইস্তাম্বুলকে মুসলমানরা একান্তই নিজেদের মত করে সাজিয়েছিলেন। আর এর ফলেই মুসলমানদের মধ্যে জগত বিখ্যাত তুর্কী স্থাপত্য শিল্পী মিমার সিনান, শাইখ হামদুল্লাহ ও খারাহিসারের মত শিল্পীরা জন্ম নিয়েছিলো। আমরা তাদেরই উত্তরসূরী। আমাদের স্থাপনাগুলো আমাদেরই হাতে গড়া। এতে অন্যদের কোনো দয়া কৃপার অংশ নেই। বলতে পারি, আমরা নিজেদের স্থাপনা নিজেরাই গড়ে তুলেছি।

মূল যে কথাটি এখানে বলতে চাই, ইসলামের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমাজের সবখানে ও জীবনের সব সেক্টরে সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ খানের মত করে ভাবতে হবে। ইসলাম সব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়- এটা আমাদের মনে প্রাণে মেনে নিতে হবে। সে অনুযায়ীই ইসলামের বলে দেয়া পদ্ধতিটা আমাদের গ্রহন করতে হবে।

বারবার বলছি, মানবিক থিওরী দিয়ে ইসলামকে মেরামত করার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং এটা সম্ভবও না। ইসলামকে মেরামত করতে যাওয়ার অর্থ হবে আমরা ইসলামকে ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে শেকড় থেকে বুঝে উঠতে পারি নি।

দুঃখের বিষয় হলো শুধু অর্থনীতিই নয়; সব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের বিশেষত্ব ও স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে চলেছি। আজকের ইতিহাসবিদদের অবস্থা এর বাইরে নয়। তাদের কেউ কেউ ইসলামকে নির্দিষ্ট একটা যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে আজকের অধুনা বিশ্বে ইসলামের অগ্রহনযোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়!

মোটা দাগে মুসলমান হিসেবে আমাদের সবাই দায়িত্ব হলো, নিজেরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ করবো। ইসলামের ইজ্জত রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকবো। তার স্বকীয়তার হেফাযত করবো। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোতে দেয়া ইসলামের দিক নির্দেশনগুলোকে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর হবো...

হীনমন্যতা রুঁখতে করণীয়

আলতিনওলুক: বর্তমান সময়ের মুসলিম ইতিহাসবিদরা হীনমন্যতার স্বীকার। কোনো একটা সাক্ষাৎকারে আপনিও এমনটি বলেছিলেন। আজকাল মুসলিমরা ইতিহাসের ক্ষেত্রে নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে গেছে। এই হীনমন্যতার মূলে আছে দূর্বলতা। পশ্চিমাদের প্রোপাগাণ্ডার উত্তর না দিতে পেরে কিছু কিছু লোক এই কথার প্রবক্তা বনে গেছে যে, ইসলামের এমন কিছু হুকুম আহকাম আছে যেগুলো এককালে সমাজের জন্য মানানসই ও উপযুক্ত ছিলো। আজকাল ওসব আর চলে না, অচল। সময় বদলে গেছে। ইসলামের দণ্ডবিধি ও এধরণের আরো কিছু বিষয় মানা এখন আর সম্ভব না। এখন আধুনিক যুগ চলছে। এদেরই একদল পুঁজিবাদকে এতোটা জোরে শোরে প্রচার করে যে, দেখে মনে হয় পুঁজিবাদকে স্বাগত জানানো ছাড়া আজকাল মুসলমানদেরও আর কোনো উপায় নেই। তারা ওসব মানুষের আচরণ থেকে সুযোগ নেয় যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ ইসলামের অন্যান্য হুকুমগুলো স্বানন্দে মেনে নেয়ার পরও যখন অর্থনৈতিক কোনো বিষয় আসে তখন পুঁজিবাদী মানসিকতা নিয়ে বলে, কী আর করা, পুঁজিবাদকে মেনে না নিয়ে ত উপায় নাই। জানার বিষয় হলো, সরলমনা ওসব মুসলমানদের রক্ষা করতে ও হীনমন্যতার স্বীকার লোকগুলোর জবাব দিতে পুঁজিবাদের গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি এর চে' উত্তম কোনো অর্থ ব্যবস্থা সমাজে উপহার দেয়া যায় কী না? বিষয়টি আজকাল খুব আলোচিত হচ্ছে। পুঁজিবাদকে রুখতে একজন সাচ্চা মুসলমানের করণীয় কী হতে পারে?

ওসমান নূরী তপবাস: প্রথমে বলে রাখি, ইসলামের হুকুমগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেয়া মারাত্মক ধরণের ভুল। কারণ ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো মানুষের প্রকৃতির সাথে একদম উপযুক্ত করে জারি করা হয়েছে। তাই মানুষের চাহিদা ও প্রকৃ

তি যেমন বদলে যায় না তেমনি ইসলামের আহকামগুলোতেও কোনো রকমের নড়চড় করার প্রয়োজন হয় না। বরং ইসলামই সবখানে ও সব যুগে মানুষদের যাবতীয় সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান দিতে পারে। এজন্য ইসলাম কোনোদিন পুরাতন হয়ে যাবে না এবং ইসলামের হুকুম কোনো দিনও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে না। মানব সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান দেয়ার গুণে ইসলামী আহকামগুলো সবসময় গুণান্বিত থাকবে। সুতরাং কুরআনে ও হাদিসে থাকা ইসলামের স্পষ্ট হুকুমগুলোকে বিশেষ একটা যুগের হুকুম বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করা ও বর্তমানে ওসব হুকুমকে অচল বলার সরল অর্থ হলো, কুফুরে পতিত হওয়ার ভূমিকা মাত্র। এ ধরণের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'কেবল দু' জন ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যেতে পারে,

১. যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের নেয়ামত দান করেছেন। সেই ব্যক্তি রাত দিন কুরআন নিয়ে মশগুল থাকে, কুরআন মোতাবেক আমল করে।

২. আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দিয়ে ধনী বানিয়েছেন। সেও রাত দিন আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে।

(মুসলিম, মুসাফিরীন, ২৬৬, ২৬৭)

অপর দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তির কোনো সীমা নেই। ইসলামের হুকুমগুলোকে আজকাল অচল বলা মানে সর্বময় জ্ঞানী ও সীমাহীন হিকমতের ধারক আল্লাহকে দূর্বল বলে দেয়া। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যখনই সমাজের রুচি পাল্টে গেছে তখনি সে সমাজের উপযুক্ত হুকুম আহকাম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নতুন করে নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শেষ যামানার নবী এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয়। আমাদের নবীর আনীত শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত আহুত সমস্ত মানবের শরীয়ত। কেয়ামত পর্যন্ত যতো সমস্যা দেখা দিবে

হযরত আলী রাদি. বলেন,

অভাবের হালতে দান সদকা বেশি বেশি করো। এতে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় লিপ্ত হতে পারবে। এবং অনেক বেশি উপার্জন করতে পারবে। (শরিফ আর রাদিয়্য, নাহজুল বালাগা, নং ১৫৮)

মানব সমাজে সেগুলোর উত্তম সমাধান দেয়ার একমাত্র ক্ষমতা রাখে আমাদের নবীর আনীত শরীয়ত তথা ইসলাম। এর বিপরীত চিন্তা করা মানে হলো- মানুষ ও সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মানুষের প্রকৃতিকে তার থেকেও যিনি বেশি ভালো জানেন, সর্বময় জ্ঞানের দরুণ অতীত ও বর্তমানের বিষয়গুলো যার কাছে সমান, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহকে অক্ষমতা, দূর্বলতা এবং নিষ্ক্রিয় বলার মত ভ্রান্ত ও ভয়াবহ ভ্রষ্টতা। আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তাঁরই দেয়া হুকুমগুলোকে ওজন করতে যাওয়া, তাঁর হুকুমগুলোকে নির্দিষ্ট একটা কালের উপযুক্ত মনে করা আর বর্তমানে সেসব হুকুমকে অচল বলে দেয়ার মত ফালতু কথা আর কি হতে পারে! এমন মূর্খ ও অজ্ঞান ব্যক্তিকে কুরআনের কয়েকটা আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন মনে হচ্ছে- **"বলুন তোমরা কি নিজেদের দীন আল্লাহকে শেখাচ্ছো? অথচ তিনি ত আসমানে বা জমিনে যা আছে না আছে সব জানেন। আল্লাহ সব বিষেয়ে খুব করেই অবগত আছেন।" (হুজুরাত, ১৬)**

"...তার মানে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো? তোমাদের মধ্যকার যারা এই ধরণের এমন আচরণ করে দুনিয়ার জীবনে তাদের কপালে দূর্গতি ছাড়া আর কোনো গতি নেই। তাছাড়া কেয়ামতের দিন ত তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। (বাকারা, ৮৫)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটি হাদিসে এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন-

"কুরআনুল কারিম এমন এক ইলাহী পয়গাম, যা ভবিষ্যতে ঘটমান সব রকমের ফেতনা ফাসাদের মোকাবিলায় মানুষদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ইলাহী এই পয়গামে তোমাদের পূববর্তীদের ইতিহাস, তোমাদের পরে আহুত জাতিদের হাল হাকিকত এবং তোমাদের জীবদ্দশায় যেসব ঘটনা প্রবাহ ঘটবে- সেসবের বিস্তারিত হুকুম বলে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারিম মূলত হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে দেয়। এটা খুবি জরুরী বিষয়। এই পয়গামকে যে গ্রহন না করে পেছনে ফেলে রাখবে আল্লাহ স্বয়ং তাকে ধ্বংস করে দেবেন। যে ব্যক্তি কুরআনের হেদায়াতের বিপরীতে অন্য কোথাও হেদায়েতের আলো খুঁজতে যাবে আল্লাহ তাকে ভ্রষ্ট করে দেবেন। (তিরমিযি, ফায়ায়িলুল কুরআন, ১৪/২৯০৬; দারেমী, ফাযায়িলুল কুরআন, ১)

কুরআন ও হাদিস থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট দলিলগুলো দেখে নেয়ার পর আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যেতে চাই। প্রথমেই খুব ভালো করে মনের মধ্যে গেঁথে নেয়া দরকার যে, ***"যেমনে পারো আয় রোজগার করো। উপার্জিত সম্পদ থেকে বেশি বেশি ইসলামের পথে ব্যয় করো"*** এমন কথা কিন্তু ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় না। উল্টো বরং ইসলামের বারংবার আমাদের তাগিদ দিয়ে বলে, ***"অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে হালাল রুজি রোজগারের প্রতি মনোযোগী হতে হবে"।*** ইসলাম অসম্ভব কিছুই কারো উপর চাপিয়ে দেয় না। তাই ইসলামের হুকুমগুলো সামর্থ্য বিবেচনা করে জারি করা হয়। সাধ্যের বাইরে কিছুই ইসলাম মুমিনদেরকে করতে বলে না।

এছাড়া উপরে উল্লেখিত আবু যরের বিষয়টিও বিদ্যমান আছে। আবু যরের এই উদাহরণ বিশেষ কিছু ব্যক্তির জন্য খাস। সবার জন্য এমনটা বিবেচ্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে দু' শতেরও বেশি বার তার পথে ব্যয় করার আদেশ করেছেন। মুমিন কলকারখানার মালিক হবে, ফ্যাক্টরী গড়ে তুলবে- এতে কোনো নিষেধ

নেই। কিন্তু মুমিন নিজের মাল থেকে বেশি বেশি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারার মানসিকতা নিয়েই এসব করবে। যদি অর্থ সম্পদই না থাকে তবে ব্যয় করবে কোত্থেকে? এছাড়াও পাক্কা একজন মুমিন অর্থ উপার্জনের পেছনে আরো কয়েকটি বিষয় নজরে রাখবে। আয়ের উৎস হালাল কী না সবসময় সতর্কতার সাথে যাচাই করবে। অপচয়ে জড়াবে না। কৃপণতা করবে না। সম্পদের দাপটে গর্ব অহংকার করবে না। বিনয়ী বেশে চলাফেরা করবে। সবশেষে সম্পদের হক আদায় করতে দিয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

ঈমানদার ব্যক্তি নিজের আয় রোজগারের পূর্ণতার দিকে মনোযোগ দিবে। কিন্তু অবৈধ পথে পা বাড়াবে না। অধীনস্ত শ্রমিকদের কষ্টের যথাযথ মূল্য দিবে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য রূপবান যুবতীদের নিজের ফ্যাক্টরীতে চাকরির সুযোগ করে দিয়ে অবৈধ প্রদর্শনীর মত নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হবে না।

সূরা বনী ঈসরাইলের ৬৪ নং আয়াতে সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে শয়তানের অংশ গ্রহনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও এই আয়াতের বাস্তবতা আজকাল আমাদের চোখের সামনে। উপার্জিত সম্পদে আমরা শয়তানের অংশিদারিত্ব দেখতে পাই। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলা হয়। সেসব প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করার অভিলাষে লোকদের আকৃষ্ট করার জন্য হারাম সব আয়োজন করা হয়। এভাবেই সমাজের ও পরিবারের আত্মমর্যাদা সম্ভ্রম কেড়ে নেয়া হয়।

ব্যবসাসহ বৈধ পন্থায় আয় রোজগার কিছুটা কঠিন হওয়ার কারণে অনেকে ধোঁকাবাজির পথ বেছে নেয়। হারাম হওয়া সত্ত্বেও সহজে ও কোনো রকমের রিস্ক না নিয়ে নিশ্চিত লাভের পদ্ধতিতে পা বাড়ায়। বেশি বেশি আয়ের নেশায় মত্ত হওয়ার কারণে কখনোও কখনোও শষ্য, পশু প্রাণী বিক্রির ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি করা হয়। খাদ্যের মাঝে ভেজাল ঢুকিয়ে দেয়া হয়। খাদ্যের মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রণ করতেও কিছু কিছু

লোক কুণ্ঠিত হয়। এতে করে মানুষদের শরীর খারাপ হয়। রোগীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এবং আধ্যাত্মিক শক্তিও হারিয়ে যায়। উল্লেখিত এসবই হালাল ব্যবসাকে হারামের দিকে নিয়ে যাওয়া অভিশপ্ত উদাহরণ। এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার কারণে হালাল ব্যবসা সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে হারামের পথে সামনে বাড়ে।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> এমন একটা সময় আসবে লোকজন কোত্থেকে উপার্জন করছে সে বিষয়ে বেখবর হয়ে পড়বে। হালাল থেকে উপার্জন করছে নাকি হারাম থেকে সে খবর তার থাকবে না।
>
> (বুখারী, বুয়ু, ৭)

সমাজে আরো একটি দুঃখজনক বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু দীনদার ব্যক্তি ইসলামের টেনে দেয়া ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক জীবনের সীমারেখাগুলো না জানার কারণে এসব বিষয়ে খুব একটা সতর্ক হতে পারে না। ফলে ইসলামের দৃষ্টিতে কীসব জিনিষ হালাল আর কীসব হারাম সে পার্থক্য করতে পারে না। এসব বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রকাশ করে এবং হারাম জড়িয়ে যায়। আবার কেউ কেউ খুব ধূর্ত হয়। তারা ইসলামের যাবতীয় হুকুক আহকাম খুব ভালোমত জানে। এরপরও "আরে ভাই, আজকাল হালাল পথে চলার ভাত নাই" অন্তসারশূন্য এসব স্লোগান বলে বলে জেনেশুনে শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হয় এবং আল্লাহর হুকুমগুলো স্বজ্ঞনে লঙ্ঘন করে!

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলতে সতর্ক একজন মুসলমানও ব্যবসায়িক জীবনে ইসলামের বহু আদেশ নিষেধকে তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারে। যেমন সমাজে এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা বড় বড় মার্কেটের মালিক। ব্যক্তি জীবনে পাক্কা মুসলমানের বেশে চলাফেরা করে। কিন্তু নিজের মালিকানাধীন দোকান ক্ষেত্রবিশেষ এমন ব্যক্তিদের কাছে ভাড়া দিতে দেখা যায় যারা তার দোকানটিকে প্রকাশ্যে হারাম কোনো

কাজের জন্য ব্যবহার করবে, মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও চরিত্রকে দলিত করার জন্য তার দোকানটি ব্যবহৃত হবে। দেখবেন 'দীনদার' মালিক জেনে শোনে তার দোকান এ ধরণের চরিত্রহীন লোকদের কাছে ভাড়া দিয়ে দেয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ভাল কাজ সম্পাদন করার জন্য যে মধ্যস্থ হবে তার সওয়াবও ভাল কাজটি সম্পাদনকারীর সমপরিমান হবে। তেমনিভাবে যে মন্দ কাজে সহযোগীতা করবে তারও মন্দ কাজটি সম্পদনকারীর সমান গুনাহ হবে। তো 'দীনদার' ঐ মালিক ইসলামের এসব শিক্ষাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের দোকান হারামের পথে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ভাড়ায় দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। এভাবেই দীনদার মুসলমান হারামের সাথে মিশে যাওয়া সম্পদকে নিজের ধারণামতে পবিত্র সম্পদ মনে করতে থাকে। দুঃখজন হলেও বাস্তব হলো, আপনার আশপাশে এধরণের বহু লোক দেখতে পাবেন। তারা নিজেদেরকে খুব দীনদার ভাবে। অথচ হারাম কাজের পাক্কা সহযোগী তারা। অথচ তাদের জানা থাকা দরকার ছিলো যে, হারাম কাজে ব্যবহৃত দোকানের ভাড়ার টাকা হালাল ও পবিত্র হতে পারে না। এজন্যই মুসলমানরা নিজে যেমন সতর্কতার সাথে সম্পদ ব্যবহার করবে তেমনি নিজের সম্পদকে অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়ার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে বেশি টাকা দিয়ে ভাড়া নিতে

যে জিনিষ নেয়া হারাম তা দেয়াও হারাম। (মাজাল্লা)

অর্থাৎ কোনো জিনিষ নেয়া, খাওয়া, পান করা কিংবা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ও হারাম হলে সে জিনিষটি দেয়া, বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ ও হারাম হবে।

চা'বে কোনোরকম বাছবিচার ছাড়াই তার কাছে ভাড়া দিয়ে দেয়া খাঁটি মুমিনের কাজ হতে পারে না। ভাড়াটিয়ে কোন কাজে ব্যবহার করবে সে বিষয়েও নজর দেয়া দীনদার মালিকের দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হবে।

আজকালের অবস্থা খুব দুঃখজনক। বাসা বাড়ি, দোকানপাট ও জায়গা জমির মালিকদেরকে এসব ক্ষেত্রে ভেজাল ও হারাম বিষের মত আক্রান্ত করে রেখেছে। তাই আজকাল কাঁটাযুক্ত রাস্তায় হাঁটতে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তেমনি খাঁটি মুমিনকে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক জীবনে সতর্ক হতে হবে। সর্বোপরি তাকে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক জীবনে পা রাখার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের দেয়া নির্দেশনগুলো খুব ভালভাবে জানতে হবে।

যেভাবেই আয় করো প্রকৃত আয় নেই

বহু কোম্পানী প্রচারনা করতে গিয়ে আকর্ষণীয় অনেক জিনিষ ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে চায়। এই কাজ করতে তারা হারাম বিষয়ের প্রদর্শনী করতে দ্বিধা করে না। এভাবে ক্রেতাদের মন জয় করে ব্যবসার পরিধি বাড়িয়ে নেয়। আবার বলে, বেশি বেশি উপার্জন না করতে পারলে ভাল কাজে ব্যয় করবো কী! সুতরাং এসব তো করি ভাল পথে ব্যয় করার আশায়। এসব কথা বলে তারা নিজেদেরকেই ধোকা দেয়। এসব লোক আজকাল মারাত্মক এক দূর্বলতার শিকার। সম্পদের পরীক্ষায় এসব লোক অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সবচে' কঠিন মূহুর্তগুলোতেও ঈমানের দাবিগুলো পূরণে সামান্যতম শিথিলতা করেন নি। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব দূর্বল ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। মুসলমানগণ জান বাঁচাতে গিয়ে মক্কায় নিজেদের ধন সম্পদ বাড়ি ঘর সবকিছু ফেলে আসার কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে মদিনায় তারা একেবারে দূর্বল অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। ঐ সময় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা নাজুক ছিলো এই থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, বদরে প্রান্তরে যাওয়ার পথে মুসলিম সৈন্যদের প্রতি তিনজন পালাক্রমে একটি উট ব্যবহার করতেন, যুদ্ধের ঘোড়া ত দূরের কথা বাহনের উট পর্যন্ত তাদের কাছে ছিলো না। অন্যান্য সৈন্যদের সাথে স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী ও হযরত আবু লুবাবা রাদি.-এর সাথে পালাক্রমে একটি উটে আরোহন করে বদর ময়দানে হাজির হয়েছিলেন।

মুসলমানদের এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মদিনার এক অমুসলিম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাজির হয়। প্রিয় নবীকে সম্বোধন করে সে বলে,

"হে মুহাম্মাদ! মদীনার মাটিকে আমার শক্তি ক্ষমতা প্রসিদ্ধ। সে কথা মদীনার সবাই জানে। শুনলাম তোমরা মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছো। তারা ত তোমাদের তুলনায় বহু শক্তিশালী। তাই আমাকে অনুমতি দিলে আমার সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। তোমাদের সাথে বদরে যুদ্ধে লিপ্ত হবো। বিনিময়ে তুমি আমার ভাগে যে যুদ্ধলব্দ সম্পদ আসবে তা পরিশোধ করবে।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রলোভনের বাহ্যিক দিকটি লক্ষ্য করে তাকে হ্যাঁ বোধক কোনো উত্তর দেন নি। বরং তিনি উল্টো তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মান্য করো?" সে না বোধক উত্তর দেয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তবে তুমি যেতে পারো। তোমার কোনো সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন আমাদের নাই। আল্লাহর সাহায্য ও নুসরতই আমাদের জন্য কাফি, যথেষ্ট।

তখনকার মত সে লোকটি চলে গেলেও কিছুক্ষণ পর আবার সে দরবারে নববীতে এসে হাজির হলো। আবারো সে আগের শর্তগুলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলো। তিনিও আগের মতই প্রশ্ন করলেন। এবারো যখন সে রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলো তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমাদের সাহায্যের কোনো দরকার নেই।"

লোকটি চলে যাওয়ার পর তৃতীয়বারের মত আবারও ফিরে আসালো। এবার সে ভিন্ন কথা বলতে লাগলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্ন করার আগেই সে বলছিলো, "হুঁ আমি মেনে নিলাম আপনি আল্লাহর রাসূল। কারণ এমন নাজুক ও দূর্বল

পরিস্থিতিতে ইলাহী কোনো শক্তির উপর ভরসা করে কেবল একজন রাসূলই এমন কথা বলতে পারে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।"

এই কথোপকথনের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওমুসলিম এই সাহাবিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন।

মোটকথা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই শরীয়তশিদ্ধ কোনো বিষয় অর্জন করতে গিয়ে শরীয়তে নিষিদ্ধ মাধ্যম ব্যবহার করেন নি। তাই কুরআনের কোথাও আমাদেরকে হালাল হারামের পার্থক্য না করে বেশি বেশি দান খয়রাত করতে পারার মানসে আয় রোজগারে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেয়া হয় নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শও আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় নি।

অন্তরের প্রশস্ততা, দান সদকার মানসিকতা খুব প্রশংসনীয় একটি অভ্যাস। এই অভ্যাস থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিৎ নয়। কিন্ত তারও কিছু সীমা পরিসীমা আছে; সেগুলোও খেয়াল রাখা দরকার।

(ইউসুফ হাস হাজিব, কুতাদগু বিলিগ)

গাড়াওদী'র সাথে একটি স্মৃতি

উপর্যুক্ত বিষয়ে আমার একটি স্মৃতি এখানে উল্লেখ করতে চাই। রোগের গাড়াওদী বেশ কয়েক বছর আগে ইস্তাম্বুল এসেছিলেন। তারকা প্রসাদে একটি কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিলেন। সাধ্যমত আমিও ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছিলাম।

কনফারেন্সের শ্রোতামণ্ডলীদের কেউ একজন গাড়াওদীকে প্রশ্ন করলো, "আপনি এক সময় খৃষ্টান ছিলেন। এরপর কমিউনিজমের প্রবক্তাও ছিলেন। এখন আপনি মুসলমান। পরবর্তীতে কি হিন্দুদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনো খেয়াল আছে? প্রশ্নটি অবশ্য হাসি মজাক করে করা হয়েছিলো। গাড়াওদী অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর করলেন,

"প্রশ্নটি যখন করেই ফেলেছেন তবে উত্তর দিতে আমার অসুবিধে নাই। দেখুন প্রাথমিক জীবনে আমি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমেরিকাতে দেখলাম সেখানকার বাজারের নিয়ন্ত্রকরা নিজেদের স্বার্থ নিঃশ্চিত করার ধান্ধায় মিলিয়ন মিলিয়ন দুধ স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলে, টনের পর টন খাবার তারা সাগরে ভাসিয়ে দেয়। এসব আচরণ আমাকে খুব পীড়া দেয়। মানসিক যাতনা থেকে মুক্তি লাভের আশায় আমি কমিউনিজমের দ্বারস্থ হই। কিন্তু খুব একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের মাঝে মানবতা বলতে কিছু নেই। অন্তসারশূন্য কিছু শ্লোগান ছাড়া কমিউনিজম আর কিছু না। এতে আধ্যাত্মিকতার কোনো শাক্তি পাওয়া যায় না। খৃষ্টবাদ ও কমিউনিজমের মাঝে কোনো একটা যুগসুত্র ও সেতুবন্ধন তৈরী করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছি বহুদিন; কিন্তু পারি নি, ব্যর্থ হয়েছি।"

আমি যখন ওসব চিন্তা চেতনায় লিপ্ত তখন আমাকে হত্যা করার জন্য ফরাসীরা চক্রান্ত করছিলো। আমার অসহায় ঐ অবস্থায়

জাযায়েরের এক মুসলিম সৈনিক আমাকে সাহায্য করতে আসে। তার সহযোগীতায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই। একসময় সে সেনা সদস্যের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার ফরাসী কমান্ডার যখন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে আদেশ করলো তখন কেন তুমি আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলে এবং তার কথার অবাধ্যতা করেছিলে?

জাবির রাদিয়াল্লাহু বলেন,

"প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ দাতা, গ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সুদের লেনদেনে যারা সাক্ষী হয় তাদের সবাইকে লা'নত করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, এদের সবাই সুদের গুনাহের ক্ষেত্রে সমান অপরাধী।"

(মুসলিম, মুসাকাত, ১০৫-৬)

সে উত্তর দিলো, আমি মুসলমান। আল্লাহর পক্ষ থেকে জানদার মাখলুকাতকে দেয়া প্রাণকে টার্গেট করা আমার কাজ না। না জেনে, না বুঝে কাউকে হত্যা করতে আমি রাজি হতে পারি না। এমনকি করলে আমি অবশ্যই কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। সেই ভয়েই আমি তোমাকে টার্গেট করে গুলি ছুঁড়তে পারি নি।

জাযায়েরের ঐ সৈনিকের মুখে উত্তরটি শুনার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত আমি ইসলামকে হিংস্র কোনো ধর্ম মনে করতাম। এই আচরণ আমাকে ইসলামে ছায়ায় আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ওসিলায় আজ আমি মুসলমান। ব্যক্তিজীবনে অর্থনীতিবীদ হওয়ার কারণে মুসলমান হওয়ার পর ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করলাম। সুদ কী? কমিউনিজম ও ইসলাম সুদকে কোন্ দৃষ্টি থেকে মূল্যায়ন করে। কোন কোন পর্যায়ে ও কী কী প্রেক্ষাপটে সুদ গ্রহন করা অবৈধ সেসব সীমারেখাসহ এধরণের আরো কিছু বিষয়ে বিস্তারিত পড়ালেখা করতে লাগলাম।

বিলাল রাদি.-এর একটি হাদিস আমাকে এসব গবেষণায় উজ্জ্বল পথটি দেখাতে সক্ষম হয়। তিনি একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুন্দর তরতাজা কিছু খেজুর নিয়ে হাজির হন। সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি এসব কোথায় পেলে?"

বিলাল রাদি. উত্তর দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে সাধারণ খুরমা ছিলো। আল্লাহর নবী পছন্দ করে খাবে- এই আশায় সাধারণ খুরমাগুলোর দিগুন দিয়ে এগুলো ক্রয় করেছি।

বিলাল রাদি.-এর এই উত্তর কাজের বর্ণনা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, "হায় তুমি একি করলে। এ ত সুদ। আজকের পর আর কোনোদিন এমন করবে না। যদি ভাল খুরমা ক্রয় করার দরকার হয় প্রথমে তোমার কাছে থাকা সাধারণ খুরমাগুলোকে বিক্রি করবে। অতপর সে টাকা দিয়ে উন্নতমানের খুরমা ক্রয় করে আনবে।"

একজন অর্থনীতিবীদ হিসেবে আমার কাছে মনে হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদের পথ খুলে দিতে পারে এমন সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। এই হাদিস আমাকে ইসলামের সামনে মাথানত করতে আরো বেশি প্রভাবিত করে।

অর্থনীতিবীদ হওয়ার সুবাদে এসব নিয়েই আমার খেলামেলা চলতে থাকে। ইসলামী অর্থনীতি কী, অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামের বিশেষ কীসব দিকনির্দেশনা আছে আমি যখন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম ঠিক তখনি আমার নজড় কাড়েন এক মহামানব। তিনি হলেন হানাফি মাযহাবের প্রধান ইমাম আবু হানিফা রাহ.। আপনাদের দুঃখ করা উচিৎ এজন্য যে, আবু হানিফা রাহ.-কে আপনাদের সামনে

আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয় উপযুক্ত পন্থায় ইমাম আবু হানিফাকে মুসলিম দুনিয়ে আজও চিনতে পারে নি।"

গাড়াওদীর কথা এখানেই শেষ। আমি এসব উল্লেখ করে যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি সেটি হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থনৈতিক জীবনেও কখনো শিথিলতা করেন নি। সুতরাং আমাদেরকেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া নির্দেশনগুলো মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

"সুদ গ্রহীতারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে কবর থেকে উঠবে যেমন ঐ ব্যক্তির মত উঠে যাকে শয়তান মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তাদের এই করুণ অবস্থার কারণ হলো, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন। আর সুদকে তিনি হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে উপদেশ মেনে সুদ থেকে বিরত থেকেকে তার পূর্বের সুদের কারবারের জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না; তা তারই। তার এই বিষয় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয় তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।" (বাকারা, ২৭৫)

ইমাম আবু হানিফা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

আলতিনওলুক: হযরত! হানাফি মাযহাবের প্রধান ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে প্রায় জায়গাতেই আলোচনা করা হয়। এটাও আমাদের সবার জানা আছে যে, তিনি ইলমের জগতে বড় একজন হাস্তি হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসা নিয়েও তিনি জীবনের একটা অংশ কাটিয়েছেন। আমরা আপনার থেকে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক জীবন সম্পর্কে কিছু ঘটনা শুনতে চাই।

ওসমান নূরী তপবাস: বলার অপেক্ষা রাখেনা ইমাম আবু হানিফা রহ. ইলম ও আত্মাধ্যিক জগতে অনেক বড় একজন হাস্তি হওয়ার পাশাপাশি ব্যসায়িক জীবনেও উত্তম আদর্শের দরুণ ইসলামী ইতিহাসের অনুপম আদর্শের ধারক হিসেবে আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। প্রকৃত অর্থেও ইমাম আবু হানিফা রহ. ব্যবসার সাথে জড়িত, অনেক বড় সহায় সম্পত্তির অধিকারী ধনী একজন ব্যক্তি ছিলেন; যেমনটি আপনিও বলেছেন। তবে তিনি ইলম নিয়ে বেশি সময় মশগুল থাকতেন। ফলে ব্যবসার কাজ কারবার অধীনস্ত কাউকে দিয়ে পরিচালনা করতেন। তবে তিনি অধীনস্তের পরিচালিত ব্যবসার হালাল হারামের বিষয়ে অবশ্যই খোঁজ খবর রাখতেন। হালাল হারামের বিষয়ে তিনি এতটাই যত্নবান ছিলেন যে একবার ব্যবসায়ী কাজের দায়িত্ব দিয়ে হাফ্স ইবনু আব্দুর রাহমানকে কাপড় বিক্রি করতে পাঠালেন। তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন,

"হে হাফ্স! আমাদের পণ্যে কিছু ত্রুটি আছে। বিক্রি করার আগে অবশ্যই ক্রেতাকে ওসব ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেবে। এবং ত্রুটি অনুযায়ী দামও কম নিবে।"

হাফ্স যখন বাজারে পণ্য উঠালেন তখন আবু হানিফা রহ.-এর কথামত কম দামে পণ্যগুলো ঠিকই বিক্রি করলেন; কিন্তু নির্দিষ্ট

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয় বিক্রয়ের বৈঠক থেকে উঠার আগ পর্যন্ত বিক্রয় চুক্তি রহিত করার অধিকার রাখবে। তারা ক্রয় বিক্রয়ের সময় যদি দুরস্ত হয়, পণ্যের দোষ গুণ সব হুবহু বর্ণনা করে তবে আল্লাহ তা'আলা লেনদেনে বরকত দান করবেন। আর যদি পণ্যের ত্রুটি গোপন রাখে ও মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে এমন লেনদেনের বরকত উঠে যায়।"

(বুখারী, বুয়ূ', ১৯; মুসলিম, বুয়ূ', ৮)

করে আলাদা আলাদা ক্রেতাদেরকে কাপড়ের ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে ভুলে গেলেন। হাফসের এই ভুলের কথা শুনে আবু হানিফা রহ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

"যারা কাপড় খরিদ করেছিরো তাদের তুমি চেনো কি?"

হাফ্স যখন না বোধক উত্তর দিলেন তখন আবু হানিফা রহ. উক্ত ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থের হালাল হওয়া না হওয়া নিয়ে সংশয় বোধ করলেন। এবং শুধু এই কারণে সম্পূর্ণ অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে সদাকা করে দিলেন। কারণ উপার্জিত সম্পদ হালাল কী না এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সম্পদের পাক পবিত্রতা ও কেয়ামতের দিন সম্পদ বিষয়ক আল্লাহর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার দিক থেকে খুব জরুরী। বলা বাহুল্য আবু হানিফা রহ.-এর এমন তাক্বওয়ার কারণে তাঁর সম্পদে অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিবেচনায় বরকত দেখতে পেয়েছিলেন।

এছাড়াও মহান এই ইমাম সুদে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে গিয়ে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা পাওয়া যায় যে, যে গাছ তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন অবিচারের ভয়ে সে গাছের ছায়াতেও তিনি বসতেন না।

আজকাল ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ একটা ভুল হলো, ক্রেতার সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো। যেমন ক্রেতাকে প্রথমে পণ্যের প্রকৃত মূল্য বলে দেয়া বিক্রেতার দায়িত্ব। ক্রেতার সরলতা, অজ্ঞতা ও

অনভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার কাছে উচ্চ মূল্যে কিছু বিক্রি করা স্পষ্ট ধোঁকাবাজি। এই বিষয়েও আবু হানিফা রহ.-এর জীবনে অনুপম একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি একবার বাজারে এসে রেশমের কাপড়যুক্ত কিছু একটা ক্রয় করতে চাচ্ছিলেন। পণ্যটির মালিক ছিলো এক মহিলা। তাকে পণ্যের দাম জিজ্ঞেস করলেন ইমাম আবু হানিফা রাহ.। মহিলাও ইমামকে চিনতো। তাই বললো, এটার দাম একশত দিরহাম হে ইমাম!

আবু হানিফা রহ. বললেন, না। এর বাজার মূল আরোা বেশি হবে। এই পর্যায়ে মহিলা দু' শ' দিরহাম দিতে বললো। আবু হানিফা রহ. বললেন এর দাম আরো বেশি। এভাবে এক শ' এক শ' করে বাড়িয়ে পণ্যটির দাম যখন মহিলা চার শ' বললো তখনোও আবু হানিফা রহ. বলছিলেন আরোও বেশি হবে তোমার পণ্যের দাম। মহিলা মনে করলেন তিনি তাঁর সাথে ঠাট্টা মজা করছেন।তাই সে বললো, আপনি কি তামাশা করছেন নাকি আমার সাথে? যা দাম চাচ্ছি তা দিয়েই কিনে ফেলুন না। তবেই ত সারে। এই কথা শুনে আবু হানিফা রাহ. অভিজ্ঞ এক কাপড় ব্যবসায়ীকে ডাকলেন। তাকে মহিলার পণ্যটির প্রকৃত বাজার মূল্য নির্ধারিত করে দিতে বললে সে পাঁচ শ' দিরহামের কথা বলে দেয়। সুতরাং আবু হানিফা রাহ. মহিলা থেকে পাঁচ শ' দিরহাম দিয়েই উক্ত পণ্যটি ক্রয় করে বাড়ি ফিরলেন। কারণ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী ব্যবসায়ীর আয় রোজগার সবচে' হালাল রিজিক:

- কথা বার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নিবে না,
- তাদের উপর নির্ভরশীলদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে না,
- অঙ্গীকার করে থাকে তা অবশ্যই পালন করবে,
- ক্রয় করার সময় খুঁজে খুঁজে অহেতুক পণ্যের দোষ বের করবে না,
- বিক্রয় করার সময় পণ্যের অপ্রয়োজনীয় প্রশংসায় লিপ্ত হবে না,
- কারো থেকে কর্য করে থাকলে সময়মতো পরিশোধ করবে এবং
- কাউকে কর্য দিলে কর্য আদায় করার জন্য কঠোরতা করবে না। সে ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী দয়া প্রদর্শন করবে।

(বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খণ্ড, ২২১)

আবু হানিফা রহ.-এর মনে একথা বদ্ধমূল ছিলো যে, ব্যবসায়ী জীবনে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া, ব্যবসায়ী পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করা, বিশেষ করে মাপে কম বেশ করা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বান্দাকে কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করাবে।

ব্যক্তি জীবন পেরিয়ে ব্যবসায়ী সেক্টরেও আবু হানিফা রাহ.-এর হালাল হারামের প্রতি এমন সতর্কতা প্রকৃত অর্থে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর হাতে গড়া সাহাবাদের অনুসরণেরই ফসল। হতে পারে উপর্যুক্ত ঘটনায় আবু হানিফা রাহ.-এর কর্ম প্রক্রিয়াটির মূল উৎস সাহাবাদের স্বর্ণ যুগে ঘটে যাওয়া নীচের এই ঘটনাটি। ঘটনাটি ছিলো এমন:

প্রসিদ্ধ একজন সাহাবি ছিলেন জারির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদি.। একবার তিনি একটি ঘোড়া ক্রয় করতে চাইলেন। পছন্দসই একটি ঘোড়ার দাম করতে গেলে ঘোড়াটির মালিক পাঁচ শ' দিরহাম দাবি করে। জারির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদি. ঘোড়ার মালিককে ঘোড়ার দাম আরো বেশি হওয়ার কথা জানান। তিনি তোমার ঘোড়াটির দাম ছ' শ' থেকে আট শ' দিরহাম হতে পারে। জারির রাদি. জানতেন ঘোড়ার মালিক বর্তমান বাজারের দর সম্পর্কে অজ্ঞ। তার এই অজ্ঞতার সুযোগ নিতে চান নি সাহাবি জারির রাদি.।

সাহাবির এই আচরণে স্বাভাবিক কারণেই ঘোড়ার মালিক অবাক হলো। তাই বিস্ময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি ঘোড়াটির মূল্য চেয়েছিলাম পাঁচ শ' দিরহাম। আপনি চাইলে পাঁচ শ' দিরহাম দিয়েই ঘোড়াটি ক্রয় করতে পারতেন। তা না করে কেন আপনি ঘোড়াটির দাম আট শ' দিরহাম পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন?" জারির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদি. উত্তরে বললেন, "কেনা কাটার ক্ষেত্রে কোনো হীলা ও ধোঁকার আশ্রয় নিবো না বলে আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদা করেছি।" (ইবনু হাজম, আল মুহাল্লা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৪)

সুতরাং আমাদেরকে 'ক্রেতাদের সম্মতিতে যে দামেই পণ্য বিক্রি করা যায় তাই হালাল' এই মানসিকতা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে। আমাদের জানা দরকার এভাবে ক্রেতাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানোর মাধ্যমে যে উপার্জন আমরা করবো তা দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে না। অধিকন্তু কেয়ামতের দিন এসব ধোঁকাবাজির পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

হযরত উমর রাদি. বলেন,

"তোমরা কারো নামায রোযার দিকে দেখো না। তোমরা দেখবে-

- কথাবার্তায় কে সৎ

- কারো কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তা কতটুকু গুরুত্ব সহকারে হেফাযত করে নাকি আমানতের খেয়ানত করে

- যখন দুনিয়ার ধন সম্পদের মুখাপেক্ষী হয় তখন হালাল হারামের বিধি বিধান মেনে চলে কি না

একশ' ধনী যদি একত্র হয়...

আলতিনওলুক: হযরত দুঃখজন একটা অবস্থা আজ আমাদের সমাজে বিদ্যমান। ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে হারামের ছড়াছড়ি। শুধু তাই না ব্যবসায়ী জীবনে লিপ্ত হওয়া হারামগুলোকে আজকাল হালাল সাব্যস্ত করার মত দুঃসাহস দেখানো হচ্ছে। যেমন খাঁটি একজন মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, উপার্জিত সম্পদ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ দান সদকাও করে। সুতরাং সে দান করার মতই উপার্জন করাটাকেও একটা সওয়াবের কাজ মনে করছে। অথচ কোনো স্থানে সে হারামের সাথেও জড়িয়ে যাচ্ছে; এই বিষয়ে তার তেমন কোনো মনোযোগ নেই। সে ভাবছে দান সদকার মাধ্যমে তার ওসব অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে। ইসলাম মানে এমন একশ' ধনী ব্যবসায়ীকে যদি জমা করা হয়, আপনিও যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামের থিওরীগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করেন যেগুলো আপনি বারবার সবখানে বলে থাকেন আপনার কী মনে হয় তারা মনে মনে কী বলবে? কেননা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হারামগুলোর সাথে তারা কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় তারা নিজেরা কীভাবে প্রশান্তি লাভ করে যে, দান সদকা করার কারণে তাদের সম্পদ হালাল হয়ে যাচ্ছে?

ওসমান নূরী তপবাস: খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আলোকপাত শুরু করেছেন। আমাদের সমাজে এই মহামারি খুব মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে। দান সদকা করার কারণে হারাম পথে আসা সম্পদকেও তারা হালাল ভাবতে শুরু করেছে। এবং এই ভেবে তারা বেশ প্রশান্তিও লাভ করে। আমার মনে হয় তাদের প্রশান্তি লাভের কারণ হলো তারা বলে, আমি ত ভাল ভাল কাজ করছি। আমার কাছে সম্পদ আছে বলেই ত আমি ওসব করতে পারছি। সম্পদ ইনকাম না করতে পারলে আমি দাতা হতে পারতাম না। অধিকন্তু আমার ফ্যাক্টরীতে হাজার হাজার লোক শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ওসব শ্রমিকরা ত আমার বদৌলতেই

রুজি রোজগার করতে পারছে। এতোগুলো মানুষের জীবন যাপনের মাধ্যম ত আমিই। এটা আমার জন্য কম কীসে। এসব ভেবেই তারা প্রশান্তি লাভ করে।

অথচ সমাজের এই শ্রেণীর লোকগুলোর জানা থাকা দরকার ছিলো, ইসলাম আমাদেরকে হারাম পথে উপার্জন করে হলেও গরীবের মুখে খাবার তুলে দেয়ার আদেশ করে না। রিজিকের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা।

প্রিয় নবী সা. এভাবে দু'আ করতেন,

"হে আল্লাহ, যে ইলম ফায়দা দিবে না, যে হৃদয়ে খুশু থাকবে না, যে নফস তৃপ্ত হবে না, যে দু'আ কবুল হবে না সেগুলো থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই।"

(মুসলিম, যিকির, ৭৩)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে ইরশাদ করেন,

"তোমরা যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে পারতে তবে তিনি পাখিদের যেভাবে রিযিক দান করেন হুবাহু সেভাবে তোমাদেরকেও রিজিক দিতেন। দেখো, তারা সকাল বেলা খালি পেটে নীড় ছেড়ে অজানা পথে উড়ে যায় আবার বিকেল বেলা ঠিকই ভরা পেটে ফিরে আসে"। (তিরমিযি, যুহদ, ৩৩)

কুরআনে আছে, **"এমন বহু জন্তু জানোয়ার আছে, যারা তাদের আগামী দিনের খাদ্য সমাগ্রী সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও।"** (আনকাবুত, ৬০) আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্পদ জমা করার পেছনে না পড়ার আদেশ করছেন। তাই খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো, হালাল পথে উপার্জন করা এবং সাধ্যমত তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

আমাদের পূর্বপুরুষ আল্লাহর নেককার বান্দাদেরকে তাদের জীবনে হালাল হারামের বিষয়ে অসম্ভব গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাহাউদ্দীন নকশেবন্দী রাহ.-এর কথাই বলা যাক। একদিন তাঁর জন্য খাবারের দস্তর প্রস্তুত করা হলো। তিনি সে দস্তরখানে আগমন করলেন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে কোনো বান্দা কেয়ামতের দিন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে এক চুলও এগুতে পারবে না:

১. হায়াত কোথায় ব্যয় করেছে?

২. ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কি না।

৩. সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে?

৪. দৈহিক শক্তি তথা যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছে।

(তিরমিযি, কিয়ামত, ১/২৪১৭)

না। বললেন, এই খাবারে নূর নেই। অন্ধকার বিরাজ করছে খাবারে। পাশের লোকজন জানালেন, হযরত এই খাবারে হারামের কোনো লেশ নেই। হালাল খাবার। তিনি বললেন, হালাল ত ঠিকাছে; কিন্তু বাবুর্চি রাগে ও অসন্তুষ্টি হয়ে তা পাক করেছে। মন থেকে পাক করে নি।

এসব বিষয় আজকাল অনেকের কাছে আজগুবি মনে হতে পারে। অথচ এসব বাস্তব। আল্লাহর ওলীদের জীবনে এসব ঘটেছে। একটা এটম যেমন দ্রুত বেগে বেরিয়ে যাওয়ার পর উল্কিপিণ্ড ঝলক দিয়ে উঠে এবং সে উল্কি লোহাকেও ভেদ করে সামনে বাড়তে সম্ভব তেমনি আধ্যাত্মিক শক্তিও সকল বাঁধা পেরিয়ে ভেতরের অনেক কিছু দেখতে সক্ষম। তাই মুমিনের জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি।

ওলী আউলিয়াদের জীবনের কথা না হয় বাদ থাক। এসব বিষয় ত আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও দেখতে পাই। যেমন বিদায় হজ্জের সময় তিনি আবরাহার বাহিনী যেখানে ধ্বংস হয়েছিলো সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। কাফেলাকে তিনি বললেন, "এই স্থানেই আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব এসেছিলো"। সুতরাং এই উপত্যকাটি দ্রুত পার হও।

তাবুক যুদ্ধের সফরেও এমন আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। ঐ সফরে সাহাবাদের

কেউ কেউ সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ ঘরগুলোতে প্রবেশ করলেন। এই দেখে তিনি সাহাবাদের ডেকে বললেন, সাবধান এখান থেকে কেউ পানি পান করবে না। কিন্তু সাহাবাগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্ক করার আগেই পানি ব্যবহার করে ফেলেছিলেন। তাই তারা ওজর পেশ করে বললে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের পানপাত্রগুলো এখান থেকেই পানি ভর্তি করেছি। এই পানি দিয়ে রুটি খামিরাও তৈরী করেছি। এখন কী করবো? তিনি বললেন, পানপাত্রগুলো খালি করে নাও। এবং খামিরাগুলো গাধাগুলোর সামনে দিয়ে দাও।

দেখুন ইসলাম আমাদের পেটে যে লুকমাটি যাবে তার ব্যপারে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আর খাবারের গুরুত্ব কেনই বা হবে না! কেয়ামতের দিন প্রথম যে পাঁচটি প্রশ্নে মুখোমুখি সবাইকে হতে হবে তার একটি হলো, "কোন্ পথে আয় রোজকার করেছিলে আর উপার্জিত সম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছিলে?।"

সম্পদের কত ভাগ দান করা উচিৎ?

কিছু লোককে বলতে শুনবেন, বেশি বেশি দান করার নিয়তেই আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি আয় করার পথ বের করতে হবে। সম্পদ না থাকলে ব্যয় করবেন কী করে! আচ্ছা সমাজের যে শ্রেণীর লোকগুলো এধরণের সুন্দর সুন্দর কথা বলে তারা মূলত তাদের সম্পদের কতভাগ ব্যয় করে?

আপনার উত্তর আপনার কাছেই থাকুক। আমি এখানে একটা স্মৃতির কথা উল্লেখ করতে চাই। তখন সৌদির বাদশাহ ছিলেন ফয়সাল। তার আমলে হজ্জের আমীর ছিলেন হাসান কুতবী। জনাব হাসান কুতবী এক সময় আমার মরহুম পিতার যিয়ারতে আসেন। তাদের মাঝে অনেক কথা হয়। একপর্যায়ে জনাব হাসান কুতবী রওজা শরীফের বিনির্মাণের কথা শুরু করেন। আব্বাজান মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। কথা শেষ হলে আব্বাজান বললেন, "আলহামদুল্লিাহ, কত সুন্দর করে রওজা মোবারক নির্মাণ করা হচ্ছে। মা শা আল্লাহ। মুসলমানরা কত সুন্দর ও কত মোবারক কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে।" আব্বাজানের এই কথায় জনাব হাসান কুতবী একটুও আবেগ দেখালেন না। কথা থামিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। কী যেনো চিন্তা করলেন। অতঃপর কথা শুরু করলেন। বললেন, তা ত ঠিকই বলছেন। কিন্তু সবচে' কঠিন কাজ হলো, সম্পদকে সঠিক পথে করতে পারা। আমি নিজে কঠিন এই পরিস্থিতির শিকার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পেট্রল পাম্পের মালিক ছিলেন।

তিনি এক নাগাড়ে আরো কিছু বলে যাচ্ছিলেন। তিনি খুব আফসোসের সাথে বললেন, "সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে আমি উসমানী শাসনামলে দেখেছি। উসমানী শাসকদের নেক নিয়ত ও ইখলাসের বদৌলতে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এখনো তাদের স্মৃতিবিজড়িত বহু নিদর্শন আমাদের নজর কাড়ে। আর বর্তমানের অবস্থা

কী বলবো! আমরা নিজেদের সম্পদের কত ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। আর যাই ব্যয় করতে আগ্রহী হই সেটারই বা কত ভাগ প্রকৃত অর্থে সঠিক কাজে ব্যয়িত হয়! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন, 'তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার বস্তুটি ব্যয় না করবে ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের ভাগিদার হতে পারবে না।"

আমার আব্বার জীবনের আরো একটি ঘটনা বলি। একবার তিনি তার অধিনস্ত কর্মকর্তা মুসা আফেন্দীকে ডেকে আনলেন। আব্বাজানের দানকৃত ও যাকাতের অংকের খাতাটি দেখাতে বললেন। হিসেব ঠিক ঠিক বুঝে নেয়ার পর নিম্নোক্ত ওসিয়তটি করলেন:

"আমার দেয়া কী পরিমাণ সম্পদ যাকাতের থেকে আর কী পরিমাণ সদকার সেটি পৃথক পৃথক জানা রাখা আমার দায়িত্ব। কারণ প্রবৃত্তি সবসময় মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়ার চক্রান্ত করে। সামান্য দান সদকাকেও অনেক বড় করে দেখাতে চায়। সে জন্য তোমার প্রতি আমার আদেশ হলো, যাকাত ও সদকাগুলোকে এক খাতায় লিখবে না, পৃথক পৃথক করে লিখবে। সবসময় চেষ্টা করবে যাকাতের তুলনায় সদকার পরিমাণ যেনো অনেক অনেক বেশি হয়। বিশেষ করে যখন অভাবে নাগাল পাবে তখন সদকার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হবে"।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> "হে ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ, তোমরা যত সতর্কতা অবলম্বন করো না কেন নিশ্চয় তোমাদের বেচা কেনায় কসম ডুকে যাবে। সেজন্য কসমের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তোমরাও বেশি বেশি সদকা করো।
>
> (আহমাদ, ৪র্থ, ৬; আবু দাউদ, বুয়ূ, ১/৩৩২৬)

আমরা যাকাত ত দিই। ভাল কথা। কিন্তু এতেই আমরা পার পেয়ে যাবো? কারণ যাকাত ধনীদের উপর ফরজ। এটা তাকে দিতেই হবে। যাকাতের পরিমাণও অনেক কম। সুতরাং যাকাত দিয়ে প্রশান্তি লাভ করা কতটুকু ঠিক হবে আমাদের জানা নাই।

আমাদের মনে যদি নবীর প্রতি ভালোবাসা থেকে থাকে তবে তাঁর জীবনাদর্শ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁকে ভালোবেসে আখেরাতেও যদি আমরা তাঁর সাথে, তাঁর হাতে গড়া সোনার মানুষ সাহাবাদের সাথে থাকতে চাই তবে ইবাদত বন্দেগী, ব্যবসা বাণিজ্য, মুয়ামালাত মুয়াশারাত- তথা আমাদেরকে জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁদের রেখে যাওয়া আদর্শ মেনে চলতে হবে। তাদের আচার আচরণ আমাদের জীবন চালানোর মানদণ্ড। সেজন্য কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আচার আচরণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে চলতে আদেশ করেছেন:

"শপথ! তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহর কাছে ও আখেরাতে হাজির হওয়ার বিষয়ে ঈমান রাখে এবং যারা বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে তাদের জন্যে নিশ্চয় প্রিয় নবীর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব, ২১)

আল্লাহর বিশেষ এক রহমত যে, আজ আমাদের হাতে আল্লাহর কুরআন যেমন সঠিকভাবে কোনো ধরণের বিকৃতি ছাড়াই রক্ষিত আছে তেমনিভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাবাহাদের জীবনাদর্শের বর্ণনাগুলোও আমাদের হাতে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

সেসব হাদিসের খাজানা থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহ সমাজের সবচে' অসহায় তথা ইয়াতিম অবস্থায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের সফলতা দান করেছেন। এবং ইয়াতিম শিশুটিকে এমন এক জীবনাচারণ দান করেছেন যে, সবার জন্য তাঁর জীবন আদর্শের প্রতীক নির্ধারণ হয়েছিলো। সবশেষে তিনি ইয়াতিম ঐ শিশুটিকে রাষ্ট্র প্রধানের আসনে সমাসীন করেছেন। এই থেকে আমাদের হাসিল করার অনেক কিছু আছে। তাঁর জীবন থেকে বুঝে আসে যে কোনো মানুষ জীবনের যেকোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন সে খুব অনায়েসেই প্রিয় নবীকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।

ইসলাম শিফাখানার নাম

ইসলামকে শেফাখানা বা সবার রোগের আরোগ্যের প্রেসক্রিপশন দানের উৎস বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। প্রকৃত অর্থেই ইসলাম সবার ব্যথা বেদনা দূর করে। সবার রোগের ঔষধ মেলে ইসলাম নামের ফার্মেসিতে। কিন্তু আজকাল এই ফার্মেসিতে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গ্লাস ভর্তি পানিতে যদি এক ফোঁটা নাপাকি ফেলে দেয়া হয় তবে নিশ্চয় নাপাকি অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও গ্লাসের পুরো পানিই নষ্ট হয়ে যাবে। পানির স্বাদ ও পবিত্রতা আর বাকি থাকবে না। তেমনি আজ ইসলামের পবিত্র ও উপকারী হুকুম আহকামগুলোকে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের থিওরীর সাথে মিশিয়ে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এখানে মূলত ইসলামের মূলে কোনো ভেজাল সৃষ্টি করা যায় নি। বরং ইসলাম স্বমহিমা নিয়েই মাথা উঁচু করে থাকবে। সে তার পবিত্রতা ঠিকই রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তার অনুসারীদের মাঝে। তারা হীনমন্যতায় লিপ্ত হয়। কমিউনিজম ও সোসয়ালিজম ইসলাম নামের ফার্মেসিতে ঢুকে মুসলমানদেরকে অসুস্থ করে তুলছে। এটা মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য মারাত্মক সমস্যা।

> হে মুমিনগণ! সতর্ক থেকো। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে বাধা না দেয়। কেউ এমন করলে তারা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে।"
>
> (মুনাফিকুন, ৯)

বুযুর্গ ওলীগণ বলে থাকেন, যদি সুখে শান্তিতে বাস করতে চাও তবে দু'টো জিনিষকে ভুলে যাও। আর দু'টি জিনিষকে কিছুতেই ভুলে যাবে না।

প্রথমত কিছুতেই তোমার রব আল্লাহকে ভুলে যাবে না। সদা সর্বদা ধ্যান করবে তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন কী না। আল্লাহর রাসূল যদি তোমর পাশে থাকতেন তবে তোমার বর্তমান অবস্থা দেখে মুচকি হাসতেন নাকি কষ্টের নিঃশ্বাস ছেড়ে তোমার জন্য আক্ষেপ করতেন- একজন খাঁটি মুসলমান এই প্রশ্নটি নিজেকে বারবার করবে।

শত আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য যে সম্পদ কামাই করেছে। কৃপণতা করেছে এই ভেবে যে, সম্পদ তার জন্য চিরকাল থাকবে। সে জন্য সে বারবার সম্পদের হিসেব কষেছে। ভেবেছে সম্পদ তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে। অবশ্যই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন পিষ্ট (হুতামা) কী? হুতামা হলো, আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃদয়ে পৌছাবে।

(সূরা হুমাযাহ, ২-৭)

দ্বিতীয়ত মৃত্যু, আখেরাত ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বকে ভুলে যাবে না। বার বার মনে করতে চেষ্টা করবে, একবার না একবার তোমাকে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতেই হবে। সেদিনকে ভুলে যাবে না যেদিন তোমাকে বলা হবে, **"তোমার হিসেব কিতাব নিজেই পড়ে নাও। বিচারক হিসেবে তুমিই যথেষ্ট।"** (ইসরা, ১৪)

বলেছিলাম আল্লাহর ওলীগণ দু'টো জিনিষকে ভুলে যেতে বলে থাকেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, যেসব ভালো ও কল্যাণ কাজ করা হয় সেগুলোকে ভুলে যাওয়া উচিৎ। কারণ সামান্য থেকে সামান্য ভালো কাজটাও মানুষের কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে। শয়তান ভালো কাজগুলোকে বড় করে উপস্থাপন করে। এর ফলে মানুষ নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করতে শুরু করে। মনে মনে হিসেব নিকেশে লেগে যায়। আমি এই পরিমাণ ভালো কাজ করে থাকি সমাজের বাকি মানুষগুলো কী পরিমাণ ভালো কাজ করে। তারাও যদি আমার মত ভালো কাজে লিপ্ত থাকতো তবে সমাজটা কতই না সুন্দর হতো। এই বলে সে মনে মনে প্রশান্তি লাভ করে। অথচ বাস্তবতা হলো আমাদের হিসেব নিজের দিকে বিবেচনা করেই করা

হবে। যদি সমাজের দিকে বিবেচনা করতেই হয় তবে ত সাহাবাদের স্বর্ণযুগের সাথে তুলনা করা উচিৎ। তা না করে চারপাশের লোকদের সাথে তুলনা করে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

দ্বিতীয়ত তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে সেটি তুমি ভুলে যাও। কষ্টদাতাকে মাফ করে দাও। কারণ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বছেছেন, ***"তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন?"*** সুতরাং যারা নিজেরা অন্যকে মাফ করে দেয় তারাই আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। আল্লাহর রহমত ও করুণা তাদের হক হয়ে যায়।

আসলেই অভিজ্ঞতাও এ কথাই বলে উপর্যুক্ত ভুলে থাকার দু'টো জিনিষকে ভুলে থাকতে পারলে এই জগতে প্রশান্তিতে থাকা যায়। আর বাকি দু'টোকে জীবনের সব ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে পারলে আখেরাত সুন্দর হয়। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করতে এসব নসিহত মেনে চলা আমাদের কর্তব্য।

সম্পদের পরীক্ষায় তাসাউফের ভূমিকা কী?

আলতিনওলুক: হযরতের কাছে আরো একটি বিষয় জানতে চাই আমরা। তাসাউফের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন কোনো ব্যক্তির জীবনে যখন অঢেল সম্পদ আসে এবং সে সম্পদ তার জন্য পরীক্ষার কারণ এতবস্থায় তাসউফ ঐ ব্যক্তিকে কী ধরণের সাহায্য করে থাকে?

ওসমান নূরী তপবাস: যদি প্রকৃত ও হকপন্থী তাসাউফের সাথে কোনো ব্যক্তি জড়িত থাকে তবে তার জন্য সম্পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একেবারে আসান। সম্পদ তাকে বড় ধরণের কোনো ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে না। কেননা আমরা দেখি যারাই সম্পদের পরীক্ষায় পড়ে হালাক হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ থাকে সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। দুনিয়ার জাঁকজমকে লিপ্ত হয়ে যখন কেউ প্রবৃত্তির বাসনা পূরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখনি কেবল সে সম্পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়।

তাসাউফ হলো প্রবৃত্তির কামনাগুলোকে দমিত করার কার্যকরী এক ট্রেনিং। তাই নিজের মনের বিরুদ্ধে সবসময় তাসাউফের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। দুনিয়ার মায়া থেকে নিজেকে পাক সাফ রাখার জন্য তাসাউফ হলো বিশেষ এক প্র্যাক্টিস। তাসাউফের কাজ হলো, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে এমন সব বিষয় থেকে বান্দাকে দূরে রেখে সদা সর্বদা তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসা।

শুধু সম্পদের পরীক্ষায়ই নয়; জীবনের প্রতিটি পদে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয় সেগুলোর মূল রহস্য জানা ও সে অনুযায়ী আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ বের করা তাসাউফের অন্যতম কাজ।

সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে সন্তুষ্টি থাকা ও সবকিছুতেই আল্লাহর ফায়সালাকে হাসিমুখে মেনে নিতে পারা আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার বিশেষ এক শিল্প। জীবনে আসা রঙবেরঙের আনন্দ খুশি ও সুখের সামনে আত্মাকে আল্লাহমুখী রাখা এবং পরক্ষণেই নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে সুখের স্থানটিকে দুঃখ দিয়ে ভরে দেয়ার মূহুর্তটিতেও আল্লাহর দিকেই মুখ ফেরানো বিশেষ এক যোগ্যতা। এটা তাসাউফের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমেই কারো দ্বারা হাসিল হওয়া সম্ভব।

পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের সুযোগ কেবল সেখানেই আছে যেখানে অল্পতুষ্টি ও আল্লাহর উপর ভরসা বলতে কিছু নেই। যে সমাজের মানুষ শুধু বুঝে নিজের লাভ। যেখানে থাকবে লোভ লালসা, হিংসা বিদ্বেষ ও অন্যায়ভাবে উপার্জনের লিপ্সা। এধরণের ঘৃণ্য স্বভাব থেকে বাঁচতে, লোভ লালসা অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপের মত জঘণ্য আচরণ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটা মুমিনকে তাসউফের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া একান্ত জরুরী। লোভ লালসার বিপরীতে তাসউফ মুমিনকে অল্পতুষ্টি বা কানাআত ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেবে। কানাআত এমন শিক্ষা যা বান্দাকে প্রকৃত অর্থে ধনী হতে সাহায্য করে। সম্পদের দাস বনে যাওয়া থেকে বান্দাকে একমাত্র কানাআত রক্ষা করতে পারে। যে কানাআতের শিক্ষা লাভ করতে পারে নি সে দুনিয়ার দাসে পরিণত হয়।

> ফরীদ উদ্দীন আত্তার রাহ. বলেন,
>
> যার ভাগ্যে অল্পতুষ্টির নেয়ামত জুটেনি সে কী করে দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে ধনী হবে! এবং কী করে সে তৃপ্ত হবে!

আরেকটি বিষয় এখানে না বললেই নয়: নেগেটিভ কিছু যখন আমাদের জীবনের উপর চড়াও হয় তখন তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টিসহ উদ্ধার হতে চাইলে যেমন তেমন ভাবে হারাম থে ক বেঁচে থাকার ফতুয়া নিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকলেই হবে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও যদি হারাম ও অপরাধ গ্রাস করে নেয় তবুও কঠিন ঐ পরিবেশ থেকে

বাঁচতে পারার একমাত্র উপায় হলো তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। আর তাসউফের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হলো আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা। তাই বর্তমানে তাসউফের প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী। প্রকৃতপক্ষেই আজকাল চারপাশে পুঁজিবাদের ছড়াছড়ি হওয়ার কারণে যে মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্যে বা অর্থনৈতিক অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে চায় তাকে অবশ্যই তাসাউফের সাথে জড়িত হওয়া দরকার। না হয় চারপাশের ধোঁকাবাজদের খপ্পরে নিজেও হারামের ঢেউয়ে ভেসে যাবে নিজেরও অজান্তে।

তাসাউফের শিক্ষায় দীক্ষিতি একজন মুমিন কিছুতেই হীনবল হয় না। সে জাগতিক জীবনে লাভ লোকসান যাই হোক সর্বাবস্থায় খুশি থাকে। কারণ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে সে শিখেছে। আর এখানেই খাঁটি মুমিনের পরিচয় মেলে। যে মুমিন সম্পদের সাথে আল্লাহর ইবাদতকে জড়িয়ে দেয় সে ব্যর্থ। সে সুখের দিনে আল্লাহর স্মরণ করলেও দুঃখ আসলে আল্লাহকে ভুলে যায়। অথচ খাঁটি মুমিনের কাজ হলো সর্বাবস্থায় সম্পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

তিন প্রকারের ব্যক্তির প্রতি বেশি বেশি দয়া করো:

১. যে ধনী হওয়ার পর দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। এবং অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়ায়।

২. সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

৩. অজ্ঞ লোকদের মাঝে বসবাসরত আলিম।

(কালামুন কিবার)

বিপদে নিরাপদ আশ্রয় ছিলো খানকাহগুলো

দূর ইতিহাস থেকে আজ অবদি তাসাউফ জনমানুষের কাজে এসেছে। ইতিহাসের শান্তি ও নিরাপত্তার যুগে যেমন তাসউফ সম্পদের মোহে পড়ে লোকদেরকে অলসতা এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে বাঁধা দিয়েছে তেমনি হামলা আক্রমণ ও এধরণের যুদ্ধ কবলিত মূহুর্তগুলোতেও তাসাউফ জনমনে শক্তি সাহস জুগিয়েছে। আধ্যাত্মিক শক্তিকে বলিয়ান করে শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানাদেরকে জাগ্রত করেছে। ব্যথিত মনের মলম ও ক্লান্ত হৃদয়ের শান্তনার কারণ হয়েছে এই তাসাউফ।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

দুনিয়ার আগ্রহ ও লোভ অন্তরে মরিচিকা তৈরী করে। আর আখেরাতের চিন্তা ভাবনা অন্তরে নূর পয়দা করে।

দিনভর ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়া লোকগুলো রাত হলে খানকাগুলোতে একত্র হতেন। সেখান থেকে আধ্যাত্মিক ইলম হাসিল করে শারিরিক ক্লান্তিটুকুও দূর করে দিতেন। আজকাল খানকাগুলো আর ঐ সময়ের মত সতেজ নয়। কিছু ব্যক্তির ঘরকোণো হয়ে যাওয়ার সাথে খানগুলোর সম্পর্ক। সমাজের সব শ্রেণীর সাথে খানকার সম্পর্ক আজকাল খুব একটা চোখে আসে না। তাই খানকাগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী, যে যুগে তাসাউফের প্রচলন ছিলো এবং সবার মাঝে তাসাউফের শিক্ষা বিরাজ করতো সে যুগে খানকাগুলো ছিলো সবার আশ্রয়স্থল। যে চাকরি বাকরি পেত না, যে কেউ পারিবারিক সমস্যায় পতিত হতো কিংবা অন্য যে কোনো ধরণের সমস্যায় পতিত একাকী সমাধান খুঁজে না পেলে খানকাগুলোতে গিয়ে ঠাঁই পেতো। সেখানে সবার আশ্রয় মিলতো। সবাই মিলে সমস্যার সমাধানে কাজ

করতো। সেজন্যই মাওলানা রুমী রাহ.-এর দুঃস্থ অসহায় গরীব দুঃখী ও জীবন থেকে হতাশ হয়ে পড়া লোকদের খানকার দিকে আহবান জানিয়ে বিশেষ দাওয়াত পেশ করতেন এভাবে: "এসো, এসো, তুমি যাই হও, তোমার অবস্থা যাই হোক তবুও তুমি এসো।"

তাসাউফের এসব শিক্ষা মূলত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে নেয়া। তাঁর জীবনেও পাওয়া যায়, তিনি যখন কোনো নেয়ামত প্রাপ্ত হতেন কিংবা কোনো যুদ্ধে বিজয় লাভ করতেন তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করতেন, "হে আল্লাহ! প্রকৃত হায়াত ত হলো আখেরাতের হায়াত।" এই বলে তিনি দুনিয়ার সাথে অন্তরের মুহাব্বাতকে দূরে রাখতেন। সম্পদের অহংকারকে কিছুতেই মুমিনদের কাছে ভিড়তে দিতেন না। এর বিপরীতে কোনো কারণে যদি মুসলমানদেরকে দুঃখ কষ্ট পেয়ে বসতো কিংবা সাময়িক কোনো পরাজয়ের গ্লানি তাদের ভাগ্যে এসে যেতো তখনো তিনি একিভাবে দুআ করতেন, "হে আল্লাহ! আসল হায়াত ত আখেরাতের হায়াত।" বিপদের সময় এমন দুআর মাধ্যমে মুসলামনদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণস্থায়ী সামান্য দুঃখ ভেঙ্গে পড়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন। ক্ষণস্থায়ী এসব বিপদের ফলে যেনো তারা হীনবল না হয়, আল্লাহর থেকে নৈরাশ না হয়- সেজন্যই তিনি এমনটি করতেন। এভাবেই তিনি সুখে দুঃখে সাহাবাদেরকে অন্তরের শান্তিটুকু উপহার দিতে পেরেছিলেন।

মোটকথা মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে তবে স্বচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতা যাই হোক সর্বাবস্থায় সে অশান্তিতে থাকে। প্রকৃত শান্তি পেতে মানুষকে সচ্ছলতার সময় বিনয়ী ও অসচ্ছলতার সময় ধৈর্যধারণকারী হতে হয়। যেহেতু তাসাউফের মূল শিক্ষা এগুলোই তাই নববী এই শিক্ষাগুলো সুখ দুঃখের সময় বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদেরকে তাসাউফের চর্চা করা জরুরী। কারণ সুখ ও দুঃখ দু'টোই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায় সুখ ও সচ্ছলতার সময়কার পরীক্ষাটি দুঃখ ও অসচ্ছলতার সময়ের পরীক্ষা

থেকে বহুগুণে কঠিন হয়ে থাকে। কেননা সম্পদের মোহে মানুষ খুব সহজেই আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে পারে। অপরদিকে দুঃখ কষ্টের সময় সাধারণত মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বারস্থ হয়। সকল কষ্ট দূর করার জন্য মানুষ আল্লাহর কাছেই হাত বাড়ায়। তাই সম্পদের পরীক্ষা বড় পরীক্ষা।

ইমাম গাজালী রাহ. বলেন,
প্রকৃত সম্মান ও শান্তি ধনী হওয়ার মধ্যে নয়;
অল্পতে সবর করার মধ্যে নিহিত।

সমাজে যদি ইসলাম সক্রিয় থাকে...

আলতিনওলুক: সমাজে ইসলামের অনুশাসন জারি রাখতে ও ব্যক্তি জীবনে ইসলাম মেনে চলার ক্ষেত্রে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি কী ধরণের ভূমিকা পালন করে? যদি একটু বলতেন।

ওসমান নূরী তপবাস: তাসাউফ মূল একজন মুমিনের ঈমানকে "ইহসানের" পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ তাসাউফ মুমিনকে আল্লাহকে দেখে দেখে ইবাদত করার মত তাঁর কাছে নিয়ে যায়। যদি সে আল্লাহকে দেখার মত যোগ্যতা অর্জন নাও করতে পারে তবুও সদা সর্বাদা আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার যাবতীয় কাজ আল্লাহর কুদরতী ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে এই অনুভূতিটুকু তার মাঝে জাগ্রত করে। যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক তার মাঝে এই চিন্তা কাজ করে যে, সে আল্লাহর সামনেই আছে।

আমাদের অবস্থা ত আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই তখন ঠিকি মনে করি যে, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান আছি। কিন্তু নামায থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর সে অনুভূতি কাজ করে না। অথচ বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তা'আলা -জামান ও মাকানের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া- সবখানে সর্বাবস্থায় বিরাজমান আছেন। আমরা সবসময় তাঁর নজরদারিতেই আছি। কিন্তু আমাদের মনে নামাযে সে অনুভূতি জেগে উঠলেও সবসময় তা বহাল থাকে না। তাই তাসাউফ আল্লাহর যিকির, মুরাকাবার প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবেই তাসাউফ মুমিনের মনে বিশেষ এক যোগ্যতা সৃষ্টি করে। ফলে তাসাউফ চর্চাকারী এক সময় নিজেকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের মধ্যে হাবুডুবু খেলতে দেখে। সে মনে করে জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ আদেশ ও নিষেধ রয়েছে। বলাবাহুল্য এমন অনুভূতি যে সমাজের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে থাকবে সে সমাজে ইসলামের সক্রিয়তা বহুগুণে বেশি থাকবে। ইসলামের অনুশাসনে সে সমাজ আলোকিত থাকবে।

দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতার পরীক্ষা

আলতিনওলুক: কিছু লোককে বলতে শুনা যায়, "একটা সময় ছিলো মুসলমানরা দারিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হতো। সেটা ছিলো তাদের জন্য পরীক্ষা। তবে বর্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ বর্তমানে মুসলমানদের হাতে প্রচুর অর্থ সম্পদ বিদ্যমান। এই ধন সম্পদই এখন মুসলমানদের জন্য বড় পরীক্ষা হয়ে দাড়িয়েছে।" হযরতের কাছে জানার বিষয় হলো, এসব বক্তব্যকে আপনি কোন চোখে দেখেন, ধনী হওয়া কি কোনো গুনাহর কাজ নাকি?

ওসমান নূরী তপবাস: বহু জায়গায় আগেও বলেছি, কে ধনী হবে আর কে গরীব হবে- সেটি একান্তই তাকদীরের মুআমালা; আমাদের হাতে না। কেউ ইচ্ছে করলেই ধনী হতে পারে না। তাই দেখবেন কত মানুষ হাজার চেষ্টা করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও দুই টাকা রোজগার করতে পারে না। অথচ কেউ কেউ জন্মসূত্রেই কোটিপতি হয়ে যায়। তাই বলছি ধনী বা গরীব হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নিধারিত। দুনিয়া নামের পরীক্ষার হলে দু'টোই বান্দার জন্য পরীক্ষার প্রশ্ন। আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধন দিয়ে পরীক্ষা করেন; আবার কাউকে তিনি গরীব বানিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে কোনোদিন দারিদ্রতা পেয়ে বসবে সেই ভয় আমি করি না। আমি বরং ভয় করি পূর্ব যুগের লোকদের কাছে যেমন দুনিয়ার অঢল ধন সম্পদ ছিলো তোমাদের হাতেও তেমনি প্রচুর ধন সম্পদ আসবে। অতঃপর যেমন গাফিল হয়ে দুনিয়ায় ডুবে থাকার কারণে ধ্বংস হয়েছিলো তেমনি তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।
>
> (বুখারী, রিকাক, ৭; মুসলিম, যুহদ, ৬)

তবে সম্পদের পরীক্ষা মারাত্মক কঠিন হয়ে থাকে। কারণ সম্পদের সঠিক ব্যবহার সবাই করতে জানে না।

যারা নিজেদের আত্মার শুদ্ধি করতে পারে তারাই প্রকৃতপক্ষে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে জানে। সবাই ত মনে করে সম্পদ সে সঠিক পথেই ব্যয় করছে। অথচ বহু মানুষ সম্পদ ব্যয় ঠিকই করে কিন্তু এই সম্পদই তার আখেরাতের বালা মুসিবত হিসেবে দেখা দিবে।

আজকাল সম্পদ মানুষের আচার আচরণে প্রভাব ফেলে। সম্পদের অহংকারে কত ধনী মানুষ গরীবের উপর জুলুম করে বসে। অথচ উচিৎ ছিলো, মানুষের আচার আচরণ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। যেখান থেকেই আসুক হালাল হারামের বিবেচনা করে সম্পদ মানুষের পকেটে ঢুকা উচিৎ ছিলো না। অবশ্য এই গুণ অর্জন করার জন্য সম্পদের দাস বনে না গিয়ে সম্পদকে নিজের অনুগামী বানাতে হবে। এই গুনটাও শুধুমাত্র সবাই যার অনুগামী হয় সে আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

> আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে। যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।
>
> (সূরা নূর, ৩৭)

এই গুণের সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রথমে পয়গাম্বরগণকে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর দেখতে পাওয়া যায় সাহাবাগণ ও আল্লাহর ওলীদের। তারা সম্পদকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানান নি। বরং দুনিয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণকে তারা আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মত এতো ধনী এই জগতে আরেকজন বান্দা আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তিনি সম্পদের মোহে আল্লাহর ইবাদতে অমনোযোগী হন নি। তাঁর অন্তরে দুনিয়াকে জায়গা দেন নি। এতো সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর এমন

বাধ্য বান্দা ছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলছেন, **"সে আমার কত উত্তম বান্দা ছিলো!"** (সাদ, ৩০)

আরেকজন ধনী পয়গম্বর ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তাঁকেও সম্পদের মোহ গ্রাস করতে পারে নি। সাধ্যমত দু'হাত ভরে তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। ফলে তার উপাধী ছিলো, আল্লাহর খলীল বা একনিষ্ট বন্ধু। আল্লাহর পথে বেশি বেশি ব্যয় করার কারণে ইবরাহীম অলাইহিস সালামের সম্পদে বিশেষভাবে বরকত হয়েছিলো। এতোটাই বরকত হয়েছিলো যে, সাধারণ লোকজনদের মাঝেও প্রসিদ্ধ ছিলো- "খলীলে ইবারাহীমের বরকত"।

এতক্ষণের আলোচনা একথা স্পষ্ট করার জন্যই যে, ধনী হওয়া কোনো অপরাধ না। সম্পদের মালিক হওয়াতে বান্দার কোনো গুনাহ হবে না। সমস্যা হলো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যাবে না। সম্পদ যেনো আল্লাহর ইবাদতে বাধার সৃষ্টি না করে। সম্পদ যদি পকেটে থাকে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ থাকে তবে কোনো অসুবিধে নেই। সমস্যা হলো, সম্পদকেই দুনিয়ার একমাত্র মাকসাদ বানিয়ে নেয়া।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচা কেনায় লিপ্ত কিছু মানুষকে দেখলেন। হে ব্যবসায়ীক দল বলে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করলেন। সাথে সাথে তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মনোযোগী হলো। আগ্রহ ভরে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> অবশ্যই কিছু ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ হিসেবে হাজির হবে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে, ভালো কাজ করে এবং সদকা প্রদান করে তারা এই দলের অন্তর্ভূক্ত হবে না।
>
> (তিরমিযি, বুয়ূ, ৪/১২১০)

সুতরাং এমন দাবি করা ভুল হবে যে, মনের শান্তির জন্য গরীব হতে হবে। ইসলাম কখনোই মুসলমানদেরকে সম্পদ অর্জন করতে ও ধনী হতে নিষেধ করে না। বরং ইসলামে মূল পাঁচটি ভিত্তির দু'টি হলো হজ্জ ও যাকাত। এই দু'টি ইবাদত সরাসরি

সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ হলেই কেবল একজন মুমিনের উপর হজ্জ ও যাকাত ফরজ হয়। সুতরাং বলা যায় ইসলাম বরং মুমিনদেরকে বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করতে উদ্ধুদ্ধ করে। হাদিসে আছে, *"সত্যবাদী, বিশ্বাসী মুমিন ব্যবসায়ীগণ কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের সাথে থাকবেন।"* (তিরমিযি, বুয়ূ, ৪)এছাড়াও আরেকটি বাস্তবতা হলো, যুগেযুগে গরীব অসহায়দের আশ্রয় দেয়ার জন্য কিছু লোকের এগিয়ে আসার প্রয়োজন হয়েছে। অনাহারের মুখে খাবারের লুকমা তুলে দেয়ার জন্য কিছু লোক সব যুগেই কাজ করে গিয়েছে। তাদের বিশেষ মর্যাদার কথাও হাদিস কুরআনে আছে। বর্তমানেও সেই প্রয়োজন উঠে যায় নি। আজও আমাদের সমাজে এমন অসহায় লোক বিদ্যমান আছে যাদেরকে দেখা শুনার দায়িত্ব ধনীদের ঘাড়ে।

এককথায় বলতে গেলে দুনিয়া বিমুখত অন্তরের কাজ। পকেটে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অন্তরে আল্লাহকে স্থান দিতে পারাই যুহদ বা দুনিয়া বিমুখত। সুতরাং দুনিয়ার কাজ কারবার ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা মুমিনের কাজ না। মুমিনের কাজ হলো সম্পদ অর্জন ঠিকই করবে কিন্তু অন্তরে ধন সম্পদের মুহাব্বত প্রবেশ করতে দেবে না।

গাফিল হওয়া

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি, যুহ্‌দ বা দুনিয়া বিমুখতা বলতে দারিদ্রতাকে বুঝায় না। বরং দুনিয়া বিমুখতা হলো, ধনী গরীবের পার্থক্য না করে সবার অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটা গুণ। আল্লাহর কর্তৃত নির্ধারিত দারিদ্রতার মধ্যে থেকেও কেউ যদি অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা লালন করে এবং দুনিয়া কামানোর পেছনে ছুঁটে তাকে কী করে যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ বলা যাবে! ঠিক একি কথা অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ দারিদ্রতার ভেতরে থেকে হাতে যা আসে বাধ্য হয়ে সেটুকু দিয়েই জীবন যাপন করার নাম অল্পেতুষ্টি নয়; অল্পেতুষ্টি হলো সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর দেয়া রিজিকের উপর শুকরিয়া আদায় করা এবং সেটুকুতেই তুষ্ট থাকা।

একটি হাদিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুহদের বর্ণনা দিয়েছেন:

"দুনিয়ায় যুহ্‌দ মানে হালালকে হারাম মনে করা নয়; তেমনিভাবে ধন সম্পদ উপার্জন না করাকেও যুহদ বলা হবে না। যুহদ হলো, নিজের অধিকারে থাকা সম্পদ থেকেও বেশি পরিমাণ আল্লাহর কাছে বিদ্যমান সম্পদের উপর বেশি ভরসা রাখা। অর্থ্যাৎ রিজিকের উপর ভরসা না রেখে রিজিকদাতা তথা রাজ্জাকের উপর ভরসা রাখা। এবং কোনো বিপদাপদে পড়ে গেলে নৈরাশ না হয়ে এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াবের আশা রাখা।" (তিরমিযি, যুহ্‌দ, ২৯/২৩৪০)

মাওলানা রুমীও যুহদের খুব সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"দুনিয়াদারী হলো, আল্লাহ থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়া। ধন সম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য, স্ত্রী, সন্তান সন্ততি- এসবের মালিক হওয়াকে

দুনিয়াদারি বলা যাবে না। আল্লাহ থেকে তোমাকে যা কিছু বিমুখ করে দেবে সেটাই তোমার দুনিয়াদারী।"

আরো একটি ঘটনা এখানে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। শাহ নকশেবন্দী রাহ.-এর গড়া একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ পারিসা রাহ.। তিনি একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে বাগদাদে যাত্রা বিরতি দিলেন। সেখানে অল্প বয়েসের সুদর্শন এক যুবক স্বর্ণকারের সাথে দেখা হয়। যুবকটি সারাদিন দোকানদারি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এক মূহুর্তের জন্যও তার দোকানে ক্রেতাদের ভিড় কমতো না। তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে তিনি মনে করলেন যুবকটি ইবাদত বন্দেগী বাদ দিয়ে সারাদিন দুনিয়া নিয়ে পড়ে আছে। তিনি খুব আফসোস করলেন যুবকটির জন্য। মনে মনে বললেন, "আল্লাহর ইবাদতের সবচে' উপযুক্ত এই যুবক বয়েসে আল্লাহকে ভুলে সারাটি দিন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আছে। আহ! শত ধিক তার জন্য।" একসময় পারিসা রাহ.-এর মনে কাশ্‌ফ হয়। তিনি মুরাকাবায় ঐ যুবককে অত্যন্ত আল্লাহভীরু হিসেবে দেখতে পান। তিনি বুঝে গেলেন যুবকটি বাহ্যিকভাবে ক্রেতাদের সাথে সময় কাটালেও তার অন্তরে আল্লাহর যিকির সদা চলতে থাকে।

যুবকটির প্রকৃত অবস্থা পারিসি রাহ.-এর কাছে উন্মোচিত হওয়ার পর তিনি আবেগে বলে উঠলেন, "মা শা আল্লাহ। পকেটে টাকা ঢুকালেও অন্তরে তার আল্লাহর রাজত্ব আছে।"

মুহাম্মাদ পারিসি রাহ. বাগদাদ থেকে আবারো হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে একসময় মক্কায় পৌঁছান। সেখানে প্রথমেই কা'বার গিলাফ ধরে এক বৃদ্ধকে আবেগে কাঁদতে দেখেন। তার যেনো দুনিয়ার কোনো খোঁজই ছিলো না। একান্তভাবেই সে আল্লাহর সাথে আলাপ চারিতায় লিপ্ত ছিলো। তার এই অবস্থা দেখে পারিসি রাহ.-এর ঈর্ষা হয়। মনে মনে বলেন, হায়! এই বৃদ্ধর মত যদি আমিও আল্লাহ নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারতাম।

কিন্তু পরোক্ষণেই আল্লাহ ওলী পারিসি রাহ.-এর কাছে ঐ বৃদ্ধর অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যায়। তিনি দেখতে পান বৃদ্ধটি দুনিয়ার বালা মুসিবত দূর হওয়ার জন্য এবং দুনিয়ার সুখ শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করছে। দুনিয়ার সমস্যার জন্য তার অন্তর এমনভাবে নরম হয়ে পড়েছে যে, দু' চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

বুঝা গেলো, দুনিয়া বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো- ধনাঢ্যতা আর দারিদ্রতা যাই হোক সর্বাবস্থায় দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে অন্তর পবিত্র রাখা। মুমিনের কাজ হলো আখেরাত ঠিক রেখে দুনিয়াদারি করা। দুনিয়ার মায়ায় ডুবে গিয়ে আখেরাতের ব্যাপারে গাফিল ও বেখবর হয়ে পড়া বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ হতে পারে না।

প্রকৃত ধনাঢ্যতার মাপকাঠি সম্পম ও পকেটের ভারি থাকা নয়। বরং অল্পতুষ্টির সাথে খরচ করতে পারাই প্রকৃত ধনীর পরিচয়। সম্পদের জায়গা অন্তর নয়, পকেট।

মাওলানা রুমী মানুষকে অতল সাগরে ভাসমান জাহাজের সাথে তুলনা করে বলেন,

"অতল সাগরের ঢেউ যতক্ষণ জাহাজের নীচে থাকবে ততক্ষণ ত জাহাজ সবার জন্যই নিরাপদ আশ্রয় কিন্তু সাগরের ঢেউ যদি জাহাজের ভেতর প্রবেশ করতে শুরু করে তবে ত ধ্বংস নিশ্চিত।" তেমনি দুনিয়ার ধন সম্পদের ভালোবাসা অন্তরে না ঢুকলে এই দুনিয়া নিরাপদ। কিন্তু অন্তরে যদি দুনিয়াদারি জায়গা করে নেয় তবেই সব বিপদ।

অর্থ্যাৎ যে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে তাকে যদি পুরো দুনিয়ার রাজত্বও দিয়ে দেয়া হয় তবুও সে আল্লাহর অনুগত্য থেকে বিমুখ হবে না। কিন্তু যার অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বাত বাসা বেঁধে নিয়েছে সামান্য ধন সম্পদও তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেতে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা- উভয় অবস্থায় সবরের শিক্ষা নেয়া দরকার। প্রয়োজনের বেশি সম্পদ থাকা ও প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ না থাকা দু'টোই খুব কঠিন অবস্থা। তবে সবরের দ্বারা আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারলে পরিণাম খুব সুন্দর হয়। ধৈর্যশীল ধনী ও ধৈর্যশীল গরীব উভয়ই সমাজের জন্য কল্যাণ ডেকে আনে। যদিও এমন লোকের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুব একটা পাওয়া যাবে না।

যারা গাফিল তাদেরকে ধন সম্পদ দেয়া হোক কিংবা তারা ফকীর হোক সর্বাবস্থায় এই শ্রেনীর লোকগুলো অপরাধী। বেশি দারিদ্রতা যেমন স্বভাব খারাপ করে দেয় তেমনি সম্পদের প্রাচুর্যতা মানুষের সম্ভ্রম নষ্ট করে দেয়ার কারণ হয়। এছাড়া অত্যধিক ধনী মানুষগুলো সম্পদের প্রতি আরো বেশি লোভাতুর হয়ে পড়ে। আর দারিদ্রতার আঘাতে পিষ্ট অভাবী মানুষগুলো চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে উভয় শ্রেণী অন্যায়ভাবে সম্পদ উপার্জন করাকে বৈধ মনে করতে শুরু করে। বিষয়টি খুবই নাজুক।

এজন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন, *"হে আল্লাহ! যে দারিদ্রতা আমাকে তোমার ইবাদত ভুলিয়ে দেবে এবং যে ধনাঢ্যতা তোমার স্মরণ থেকে আমাকে বিমুখ করে দেবে- তা থেকে তোমার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।"* (ইবনু আব্দিল বার্, জামি'. খণ্ড ১, পৃ. ৭২৭)

হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য এটাই যে, দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা ক্ষেত্রবিশেষ দু'টোই মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ।

স্বল্প খরচ করে বেশি বেশি দান করা

দুনিয়ার ধন সম্পদকে কুরআন ও সুন্নাতের দিক নির্দেশনা মোতাবেক খরচ করতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এমন ব্যক্তিরা প্রকৃত ধনীর স্বাদ অন্তরে লাভ করে। পরকালের স্থায়ী রাজত্বও লাভ করতে পারে। এই জন্য ধনী মুসলিমগণ নিজের প্রয়োজনে যখন খরচ করে তখন স্বল্প ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ রাখে। আর আল্লাহর পথে ব্যয়ের সময় দু'হাত ভরে বেশি বেশি দান করে। সাহাবাদের মধ্য থেকে আবু বকর, ওসমান ইবনু আফ্ফান, আব্দুর ইবনু আউফ রাদি. ও পরবর্তীদের মাঝে আবু হানিফা এবং উবাইদুল্লাহ আহরার রাহ. এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের কর্মপন্থা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছু আছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

দান সদকার মানসিকতা দুনিয়ার দিকে প্রলম্বিত জান্নাতের একটি গাছের ঢাল। ঐ গাছে কোনো একটি ঢালে যে মজবুত করে ধরে রাখবে সে ঢাল তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। কৃপণতা হলো জাহান্নাম থেকে দুনিয়ায় চলে আসা একটি গাছের মত। যে ঐ গাছের ঢালের সাথে লেগে থাকবে সে জাহান্নামে যাবে।

(বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান, ৭ম, ৪৩৫)

দান করার মানসিকতা না রেখে যারা আরো বেশি ধনী হতে চেষ্টা করে তাদের ধন সম্পদ ফেতনা ও ধ্বংসের কারণ হয়। মানবতার বিপক্ষে তাদের এই আচরণ ক্ষমাযোগ্য নয়। তাদের একমাত্র কাজই হয় প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করা। হিতাহিত জ্ঞানও তাদের থাকে না। সম্পদের মোহে তারা অন্ধ হয়ে যায়। তাই ত ফেরাউন দুনিয়ার রাজত্ব পাওয়ার পর অহংকালী হয়েছিলো। নিজেও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছিলো, অধীনস্তদেরও পথভ্রষ্ট করেছিলো। এমনকি এক সময় "আমিই তোমাদের সবচে' বড় প্রভু' দাবি করার মত নির্বুদ্ধিতা করতেও তার বিবেক বাধা দেয় নি। দুনিয়ার

দাপটে আল্লাহর অবাদ্ধতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ক্ষণস্থায়ী জীবনের এসব শক্তি পাওয়ার তাকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে এই জগতেও রক্ষা করতে পারে নি। আর আখেরাতে ত তার জন্য সীমাহীন আযাব আছেই।

যারা ধন সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো এবং যাদের সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়েছিলো তাদের একজন হলো, কারূন। সেও ফেরউনের মত সম্পদের দাপটের বেমারে লিপ্ত হয়েছিলো। এবং আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছিলো। অথচ কারূন যখন গরীব ছিলো তখন সে তাওরাতের বড় একজন পণ্ডিত ছিলো। লোকদেরকে সে তাওরাত ব্যাখ্যা করে বুঝাতো। ধন সম্পদ লাভের পর সে অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন করতে লাগলো। তার এই অবস্থা দেখে আশপাশের লোকজন তার থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। তার অহংকারে বিপরীতে তাকে সতর্ক করে বলা হলো, "অহংকার করো না। আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না।" কিন্তু কারূন সম্পদের মোহে এসবে কান দেয় নি। সে নেয়ামতদাতা আল্লাহকে ভুলে ক্ষণস্থায়ী সম্পদের উপর ভরসা করে আল্লাহর অবাধ্যতা করতেই থাকলো। পরিণামে যে সম্পদের উপর সে ভরসা করেছিলো তা সহ তাকে জমিনে দাবিয়ে দেয়া হলো। আজ তাদের ধ্বংস স্তুপ ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। ইতিহাসও তাদের নাম সম্মানের সাথে স্মরণ করে না।

মোটকথা, বান্দা যখন আল্লাহকে ভয় করে চলে তখন ধনী বা গরীব সে যাই হোক সর্বাবস্থায় নিজেকে হকের উপর অবিচল রাখতে সচেষ্ট থাকে।

অপব্যয় ও বিলাসিতার সীমা

আলতিনওলুক: বর্তমানে মুসলিম যেসব মহামারি ছড়িয়েছে তার মধ্যে প্রধানত হলো, অপচয় ও বিলাসিতা। সীমাহীন অপচয়ে সবাই লিপ্ত। বিলাসিতার পেছনে দৌড়ে বেড়ায় সাবাই। সবচে' আধুনিক ও লেটেস্ট মডেলের গাড়ি বাড়ি ও ফোনগুলো দেখতে পাওয়া যায় মুসলমানদের হাতে। এসব ত কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়াও আরো বহু ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যাবে যেসব ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ সীমাতিরিক্ত অপচয়ে লিপ্ত রয়েছে। হযরতের কাছে আমাদের জানার বিষয় হলো, ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা আছে কী না? যদি কেউ এসে আপনাকে বলে, "হযরত! আমার বাড়ি গাড়ী সব আছে। ধন সম্পদের কোনো অভাব নেই। দৈনন্দিন আয়ের উৎসও বিদ্যমান। সমাজের ধনীদের কাতারে আমার নাম। আমার জন্য ব্যয়ের ও বিলাসিতার সীমা কী হতে পারে?" কিংবা প্রশ্নটিকে এভাবেও করা যায়, কোনো মুসলমান যাকাত ও ইসলামের অন্যান্য হুকুমগুলো পালন করার পর সে কি যতেচ্ছা তার সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীন? যেভাবে ইচ্ছে ও যেখানে ইচ্ছে সে কি সম্পদ ব্যয় করতে পারবে?

খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে জীবিকার সন্ধানে মগ্ন থাকা তাদের জন্য সম্ভব নয়। অজ্ঞ লোকেরা কারো কাছে হাত না পাতার কারণে এসব লোককে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহর তা'আলা অবশ্যই জানেন।

ওসমান নূরী তপবাস: ব্যয় ও বিলাসিতার সীমা তাকওয়ার দাবি অনুযায়ি একরকম আর শরীয়তের অনুমোদনের বিবেচনায় হবে আরেক রকম। প্রথম কথা ত যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। এই বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল

করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে সম্পদ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আমাদের কাছে আমানত। যাদেরকে তিনি সম্পদ দেন নি সেসব গরীব দুঃখিদের দায়িত্ব তিনি ধনীদের ঘাড়ে দিয়ে রেখেছেন। আমার কাছে আছে; গরীবদের কাছে নাই। এর মানে ত এটাই যে, তার সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। মুমিন হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই অনুভূতি সবার মাঝে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। এই অনুভূতি জাগ্রত করতে পারলে সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারও শেখা সম্ভব হবে।

শেখ সা'দী সিরাজী বলেন,

"আল্লাহর ওলীগণ যেসব দোকানে কেউ যায় না সেসব দোকান থেকেই বেশি বাজার সদায় করে।"

অর্থাৎ তাঁরা গরীব ও অসহায়দেরকে খুঁজে বের করেন। গরীব দুঃখীদের সঙ্গ দেন। অভাবীদের অভাব মোচনে চেষ্টা করেন। চোখ লজ্জার ও সভ্রান্তের কারণে যারা কারো কাছে হাত পাতে না আল্লাহর ওলীগণ ওসব লোকদের পাশে দাঁড়ান। তাদের খুঁজে বের করেন।

মুমিনের হৃদয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান থাকবে। সমাজের কোন্ কোন্ ব্যক্তির দায়িত্ব তার ঘাড়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তাদেরকে সে খুব ভাল করে চিনে রাখবে। সে গুরুদায়িত্ব পালনে যত্নবান হবে। যারা তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর হাত বাড়াবে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কিন্তু চক্ষু লজ্জার কারণে যারা কারো কাছে হাত পাতে না তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। নিজের প্রয়োজনে যেমন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানো হয় তেমনি সমাজের লাজুক শ্রেণীর অভাবীদের খোঁজেও তাদের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে। সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনিই এসব লোকদের মাঝে আমাদের সম্পদ বণ্টনের আদেশ করেছেন। আমাদেরকে আমানত থেকে তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পদে অপচয়ের কোনো অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে! যে সম্পদ আমার না সেটি ইচ্ছেমত আমি কী করে ব্যবহার করতে পারি! এটা কি আমানতের খেয়ানত নয়?

এবার আসুন একজন মুসলিম শরীয়তের হুকুমগুলো পালন করার পর ইচ্ছেমত সম্পদ ব্যয় করার স্বাধীনতা রাখে কী না সেই প্রশ্নটির উত্তরের দিকে মনোযোগ দিই। এককথায় বলতে গেলে শরীয়তের হুকুমগুলো ঠিক ঠিক আদায় করার পরও কোনো মুসলমান নিজের ইচ্ছেমত যেখানে চায় সেখানেই সম্পদ ব্যয় করার অধিকার রাখে না। কারণ কুরআন সুন্নাহর গণ্ডির ভেতরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই একজন মুসলিম স্বাধীন। এর বাইরে তার কোনো স্বাধীনতা নেই। কুরআন সুন্নাহর বাইরে গেলেই তাকে প্রবৃত্তির বাসনা গ্রাস করে নিবে। আগেও বলে এসেছি, মুমিনের আয় রোজগার যত বেশিই হোক সে নিজের জন্য সীমিত খরচ করে বাকিটুকু আখেরাতের পুঁজি হিসেবে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
>
> প্রকৃত গরীব হলো, যে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর মতো সম্পদের মালিক নয়। এবং প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন কেউ তার থাকে না অথচ এমন কঠিন অবস্থায়ও প্রকৃত গরীব কারো থেকে কিছু তলব করে না। (বুখারী, যাকাত, ৫৩)

মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনের চে' বেশি ব্যয় করলে তাকে অপব্যয় বা ইসরাফ বলা হয়। আর প্রয়োজনের সময়ও ব্যয় না করা এবং সবকিছু নিজের মুষ্টিতে আটকে রাখাকে বলা হয়, কৃপণতা। এই দু'টোই নিন্দনীয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনোটাই কাম্য নয়। এসবের বিপরীতে ইসলামী আদর্শ আমাদেরকে মধ্যপন্থী একটা পথ দেখিয়ে দেয়। কুরআনে আছে, **"...হে রাসূল! তারা আপনাকে আল্লাহর রাহে কী পরিমাণ ব্যয় করবে জিজ্ঞেস করতে আসে। আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের প্রয়োজন মেটানোর পর বাকিটুকু আল্লাহ রাহে ব্যয় করো।"** (বাকারা, ২১৯)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যুদ্ধলব্দ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসতো। চাইলে তিনি সর্বোচ্চ বিলাসিতার সাথে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় দুনিয়াবিমুখ অনুপম

আদর্শের প্রতীক হিসেবে জীবন যাপন করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। না হলেই না- এই পরিমাণ পোষাকাদি তিনি পরিধান করতেন। খুব সাদাসিধে জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি। সামান্যতেই নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বাদ বাকি সবকিছু অনাহারীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি শুকরগুজার ধনী লোকদের নিতৃত্ব করে গেছেন। অপর দিকে তার জীবনে এমন দিনও অতিবাহিত হয়েছে যেদিন তার ঘরে একমাত্র পানি ব্যতিত কিছু পাওয়া যেত না। দিনের পর দিন চুলোতে আগুন জ্বলতো না। ওসব দিনগুলোতেও তিনি আল্লহর শুকরিয়া করেছেন। এভাবে তিনি গরীব দুঃখী ও অভাবীদেরও করণীয় সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গিয়েছেন।

মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহ. দুনিয়ার লোভ লালসাকে এই উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন:

"বস্তবাদী জীবনে যারা মেতে থাকে তাদের দুনিয়ার উদাহরণ হলো, সাগরের পানি পান করার মতো। যতো পিপাসার্ত হয় ততো পান করে। আর যদো পান করে ততোই পিপাসার্ত হয়।"

একদিন সাহাবাগন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুনিয়াবী কিছু কথাবার্তা বললেন। তাদের আলোচনা তিনি শুনলেন। এরপর ইরশাদ করলেন,

"তোমরা কি শোনো না, তিনি আবারো বললেন, তোমরা কি শোনো না নাকি যে, সাদাসিধে জীবন যাপন করা খাঁটি ঈমানের পরিচয়। এই কথাটিও তিনি দু'বার বললেন।" (আবু দাউদ, তারাজ্জুল, ১/৪১৬১; ইবনু মাজাহ, যুহ্দ, ৪)

একজন মুমিনের প্রয়োজনেরও একটা সীমা হাদিসে বেঁধে দেয়া হয়েছে। একটি হাদিসে এসছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"অপব্যয়ে লিপ্ত না হয়ে খাও, পান করো, পরিধান করো, পাশাপাশি সদকাও দাও।"** (বুখারী, লিবাস, ১)

অপর আরেকটি হাদিসে আছে, *"তোমার মনে যাই চাবে, যেদিকেই মন টানবে সেটাই যদি পূরণ করতে যাও তবে নিশ্চয় সেটা অপব্যয় হবে।"* (ইবনু মাজাহ, আতয়িমাহ, ৫১)

ইসলামের শরীয়ত চোখের খিদে ও আরো চাই আরো চাইয়ের মানসিকতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেজন্যই ইসলাম অত্যধিক আয় ও সীমাহীন ব্যয়ের জন্য অনুমতি দেয় না। বরং এই দুয়ের মধ্যবর্তী একটা পন্থা গ্রহন করার পরামর্শ দেয় ইসলাম। আলী রাদি.-এর প্রসিদ্ধ একটা উক্তি আছে। তিনি বলেন, "যে সমাজের ধনী লোকগুলো অপচয়ে লিপ্ত হবে সে সমাজের গরীবরা অবশ্যই অনাহারে থাকবে।"

"...যারা স্বর্ণ রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ জানিয়ে দিন।"

(তওবা, ৩৪)

ইয়াহয়া ইবনু মুয়াজ রাদি. সাংঘাতিক দুনিয়াদার একজন পেশাদার বিচারকের সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন,

"হে হাকিম! আল্লাহ ত তোমাকে ইলম দিয়েছেন। অথচ আমি ত দেখছি,

তোমাদের অট্টালিকাগুলো রোমীয় অট্টালিকার মত

দালান কোঠাগুলো কিসরার দালান কোঠার মত

বসবাসের রুমগুলো কারূনের ঘরবাড়ির মত

ঘরের দরজাগুলো তালুতের ঘরের দরজার মত

তোমাদের পোষাকাদি জালুতের আলিশান পোষাকের মত

জীবন পরিচালনাপদ্ধতি যেনো শয়তানের সাথে পুরোই মিল

অভাবে যেন তোমরা আল্লাহর অবাধ্যদের মত হয়ে যাও

তোমাদের গন্যমান্য লোকগুলো ফেরাউনের মন্ত্রীদের মত

শাসকেরা থাকে সুদ ঘুষের চিন্তায় মত্ত

মরার আগেও যেনো তোমরা জাহিলিয়্যার পথ ধরে এই দুনিয়া ত্যাগ করো- আচ্ছা বলো ত তোমাদের এসব আচরণের সাথে ইসলামের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

বাস্তবেই আমাদের সমাজে আজকাল অতিরিক্ত ব্যয়, লোভ লালসা, সীমাহীন বিলাসিত ও লৌকিকতাপূর্ণ খরচাদি মহামারির আকারে বেড়ে গেছে। অথচ মুসলিমদের উচিৎ ছিলো এসব বিষয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া। তাদের জীবনে এসব পাওয়া যায় না। তাদের মনে সবসময় জাগ্রত থাকতো আগামীকাল হয়তো আমার ঠিকানা হবে কবর। মৃত্যুর স্মরণ সবসময় তাদেরকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহ দিতো। তাই কী ভক্ষণ করলো আর কী গায়ে দিলেন- সে সবের পায় পায় হিসেব সবসময় কষতেন। আল্লাহর এই ফরমান এক মূহুর্তের জন্যও তারা ভুলে যেতেন না, **"অবশেষে কেয়ামতের দিন এই দুনিয়ায় তোমরা যা যা ভোগ করো তার পুঙ্খানোপুঙ্খ হিসেব অবশ্যই দিতে হবে।"** (তাকাসুর, ৮)

তাই বারবার বলছি 'ইচ্ছেমত হারাম হালালের বিচার না করে আয় করো আর স্বাধীনমত ব্যয় করো' এই থিওরীর কোনো স্থান ইসলামে নেই। কারণ মুসলমান দুনিয়ার অগ্রগতি উন্নতির জন্য ভূমিকা রাখবে। এটা তার দায়িত্ব। পুরো জগতে আল্লাহর কালিমার পতাকা উড়ানোর জন্য তাকে কাজ করে যেতে হবে। সাহাবাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখুন। তারা এই লক্ষ্যে চীনে, সমরকান্দে, হিন্দুস্তানে এমনকি আফ্রিকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিলেন। পৃথিবীর দিকে দিকে তাদের এই পদচারণা কেন? একমাত্র ইসলামের স্বার্থে।

টাকা পয়সার হিসেব করে হয়তো আল্লাহর ফরজ করা যাকাত দিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর এমন অনেক নিয়ামত রয়ে গেছে যেগুলো হিসেব করে শেষ করা যাবে না। সেসব নিয়ামতের শুকর আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভবও না। বরং এমন অনেক নিয়ামতও

আছে যেগুলোকে আমাদের অনেকে নিয়ামত হিসেবে জানিও না। তাই সাহাবাগণ জীবনের সবকিছু ব্যয় করে আল্লাহর ওসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মেহনত করে গেছেন।

আল্লাহর নিয়ামতের সবচে' বড় শুকরিয়া হলো আল্লাহর রাহে ব্যয় করা ও তার দীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত। কারণ মানুষ এই জগতে তাঁর প্রতিনিধি। সাহাবাগণ এগুলো সঠিকভাবে পালন করে গেছেন। সামান্য সময়ের জন্যও তারা থেমে যান নি। হীনবল হন নি। আল্লাহর পথে চলতে চলতে ক্লান্তি পেয়ে গেলেও তারা বিশ্রামের জন্য সময় ব্যয় করেন নি। সবারই জানা থাকার কথা, বিদায় হজ্জের ভাষণে এক লক্ষ বিশ হাজারের মত সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। অথচ মক্কা ও মদীনায় বিশ হাজার সাহাবির কবরও খোঁজে পাওয়া যায় নি। বাকি সাহাবিরা

হাদিসে আছে,

এমন এক যুগ মানুষের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে যখন সব জল্পনা কল্পনা ও চেষ্টা সাধনা শুধু পেট পালনের জন্য হবে। ধনীদেরকে সে যুগে ভদ্র মনে করা হবে। সবার অকর্ষণ থাকবে খারাপ মহিলাদের দিকে। দীন বলতে তারা টাকা পয়সাকে বুঝবে। এরাই সবচে' নিকৃষ্ট মানুষ। (আলী আল মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, খণ্ড ১১, ১৯২/৩১১৮৬)

কোথায় আছেন? তারা ইসলামের প্রচারে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের এসব কর্ম প্রক্রিয়া আমাদের কী শেখায়?

আলতিনওলুক: আপনার বাতলানো পদ্ধতিতে সমাজের ধনী গরীব সবাইকে চলা উচিৎ। সেজন্য মনে হয় প্রথমেই ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্খাগুলো বাদ দিয়ে সাদাসিধে জীবন পরিচালনার দরকার হবে।

ওসমান নূরী তপবাস: হতে পারে। কিন্তু এতে ক্ষতির ত কিছু নেই। সবাই আজকাল উচ্চাকাঙ্খী। সহজ একটা উদাহরণ দিই। আমাদের হাফেজী মাদ্রাসাগুলোর দিকে দেখুন। ওখানে শুধুমাত্র গরীবদের সন্তানদের আসতে দেখবেন। ধনীরা নিজেদের সন্তানদের খুব একটা পাঠায় না মাদ্রাসায়। কিন্তু কেন? ভবিষ্যতের উন্নত জীবনের আশায়ই ত, তাই না। কিন্তু বাস্তবতা কী? কাদের জীবন বেশি উন্নত? কোন ধরণের শিক্ষত লোকগুলো সমাজে বেশি সুখি?

সাহাবাদের অনুসরণ

অলতিনওলুক: খুব প্রসিদ্ধ একটা সমালোচনা সমাজে শোনা যায়। ধার্মিক লোকগুলো সাধারণত ফকির ও গরীব শ্রেণীর হয়। তার মানে কি ধনী হলে ধার্মিকতা কমে যায়? ধর্ম ও সম্পদ দু'টো কি একসাথে হতে পারে না?

ওসমান নূরী তপবাস: আপনি যে বিষয়টির আলোচনা সামনে নিয়ে আসলেন দুঃখজনকভাবেই সেটি আত্মশুদ্ধি থেকে দূরে থাকা ও হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করার বিষাক্ত একটা ফল।

পেছনের ইতিহাসের দিকে দেখুন। সাহাবা রাদি.-এর উত্তম আদর্শ চোখের সামনে বিদ্যমান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ইসলামের নমুনা করে হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। তাদের কোনো একজনের জীবনেও কি ধন সম্পদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দীনকে বিলীন করে দেয়া কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়? বাহ্যিক সুখ শান্তির জন্য ধর্মীয় বিষয়ে কি তারা শিথিলতা করেছেন কখনো? তাদের জীবনে কি অপচয় ছিলো? কৃপণতা করেছেন তারা কখনো? অন্যের প্রতি দয়া ও কৃপার অবস্থা ছিলো একটা হাদিয়া এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরতে ঘুরতে সাত ঘর পেরিয়ে অবশেষে মালিকের ঘরে ফিরে আসতো। এতোটাই বড় হৃদয়ের লোক ছিলেন তারা। সবাই মনে করতো আমার চে' এই হাদিয়া ভোগ করার উপযুক্ত লোক সমাজে বিদ্যমান থাকতে আমার দ্বারা হাদিয়া গ্রহন করা মানায় না। এটা অন্যের হক। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে মূল মালিকের কাছে হাদিয়া ফিরে আসতো। চিন্তা করা যায়, কেমন ছিলো তাদের আদর্শ! তাদের উত্তম চরিত্রের বর্ণনা করে কি শেষ করা যাবে? আজকের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ওসব সফল মানুষের জীবন থেকেই আমাদেরকে উপদেশ করতে হবে। আমরা আজ তাদের আদর্শের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহর দীনের ধারক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে আপন দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করার পরও বহু সময় সাহাবাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে অনেক কিছু করেছেন। যেমন হায়াতের শেষের দিনগুলোতে একদিন তিনি সমস্ত সাহাবাদের জমা করলেন। জীবনের পদে পদে শুধু মানুষই নয় জীব জন্তুদের হকও হুবাহু আদায় করার পরও তিনি সাহাবাদের সম্বোধন করে বললেন, ***"হে আমার সাহাবারা! আমি যদি অন্যায়ভাবে কারো পিঠে আঘাত করে থাকি সে যেনো তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়; এই ত আমার পিঠ! আর কারো সম্পদ যদি গ্রাস করে থাকি তার জন্যও আমার ধন সম্পদ খোলা। অবশ্যই যেনো সে ঐ সম্পদের ক্ষতিপূরণ আমার থেকে চেয়ে নেয়।"***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

পরিশোধ না করার মানসিকতা নিয়ে যে ঋণ নিবে কেয়ামতের দিন সে লোক আল্লাহর সামনে চোর হিসেবে দাঁড়াবে।

(Ibn Majah, Sadakat, ১১/২৪১০)

এসব হাদিসের মূল শিক্ষাটা আমাদের নিতে হবে। প্রতিটা মুসলমানের মাঝে এই অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। সবাইকে ভাবতে হবে, "আমার উপর কি অন্য কারো হক আছে কী না? আল্লাহর দরবারে কেয়ামতের দিন কীভাবে হাজির হবো? সেদিন আমাকে বিপাকে ফেলে দিতে পারে এমন কোনো অপরাধ কি করেছি? কারো উপর জুলুম করেছি কি এই জীবনে?"

একবারের ঘটনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজে সহযোগীতা করার জন্য মিদআম নামের একটা গোলাম ছিলো। একদিন সে প্রিয় নবীর কাজে ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় হঠাৎ অজানা একটা তীর এসে তার গায়ে আঘাত করে। এবং সে মারা যায়। সাহাবাগণ তার এই মৃত্যুর খবর শুনে নবীর দরবারে হাজির হন। তার মৃত্যুতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সামনে বলাবলি করছিলো, "হে মিদআম! জান্নাত তোমাকেই শোভা পাবে। হে রাসূলাল্লাহ! আপনার খেদমতের লিপ্ত থাকা মিদআমের খুশ নসীব।"

তাদের এসব কথাবার্তা শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, *"না, বিষয়টি এমন নয়। সে সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! খায়বারের যুদ্ধে গনীমতের সম্পদ থেকে আত্মসাতের অপরাধে তার জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত আছে।"*

এটা শুনে সাহাবারা খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। ঐ সময়ই এক ব্যক্তি প্রিয় নবীর কাছে জুতোর দু'টির ফিতা নিয়ে হাজির হয়। এবং বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমিও এই দু'টি ফিতা গনীমতের সম্পদ বণ্টন হওয়ার আগে আমার জুতোতে লাগিয়ে ছিলাম।"

সাথে সাথে তিনি ইরশাদ করলেন, ***"এসবের কারণে তোমার জন্যও জাহান্নামের দু'টি আগুনের রশ্মি নিধারিত ছিলো।"***(বুখারী, আইমান, ৩৩; মুসলিম, ঈমান, ১৮৩)

মোটকথা, যে অণু পরিমাণও ভাল কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে। অপরদিকে যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ করবে সেও তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাবে।

বুদ্ধিমান লোকেরা এই বাস্তবতাকে এক
মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না যে,
হালাল সম্পদের হিসাব নিকাশ হবে আর
হারামের জন্য আযাব হবে।

স্বর্ণের পাল্লা আর কাঠের স্কেল

আমাদের জীবন কিন্তু বিরামহীন চলছে। ভাল মন্দ যাই করি সেভাবেই জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমান তারাই যারা প্রতিটি মিনিটের হিসেব রাখে। আল্লাহর ওলীগণ জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতেন। স্বর্ণকারের পাল্লার মত খুব সাবধানের সাথে সময় পার করতেন। কারণ স্বর্ণকারের পাল্লাতে মিলিগ্রামেরও পার্থক্য নজরে পড়ে। যার মাঝে আল্লাহর ধ্যান খেয়াল জাগ্রত নেই সে জীবনের মূহুর্তগুলোকে এতোটা সতর্কতার সাথে পালন করতে পারে না। এমন লোকদের অবস্থা হলো জীবনের প্রতি একেবারেই বেখবর। দিন যাচ্ছে রাত আসছে। এভাবেই কেটে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জীবন। তারা হয়তো আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের মত স্বর্ণকারের পাল্লার মত নিজের জীবনকে মাপতে পারবে না; কিন্তু তারা যদি কাঠ মাপার যন্ত্রের মতও জীবনের হিসেবটা রাখতো তবুও তাদের কল্যাণ হতো। যেখানে গ্রাম মিলিগ্রামের পার্থক্য ধরা না পড়লেও কেজি ও কিলোকিগ্রামের ব্যবধান ধরা যেত। কিন্তু এটুকুই আজকার কতজন লোক করে থাকে। জীবনের হিসেব কত করে। অথচ এটা ছিলো ঈমানের দাবি।

এক আল্লাহর ওলীকে প্রশ্ন করা হলো, "নফ্স প্রবৃত্তি কী?" তিনি উত্তর করলেন, "তোমার চোখের পাতা দু'টো আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে দাও। এবার বলো, কিছু কি দেখতে পাচ্ছো?" অর্থ্যাৎ যে নফ্সকে পরিশুদ্ধ করা হয় নি সেটি হলো নিজেকে অন্ধ বানানোর হাতিয়ার। নিজেকেই নিজে ধোকা দেয়া। এর কারণ হলো, নফ্স কখনো বৃদ্ধ হতে চায় না। ধ্বংস ও মৃত্যুকে সে মেনে নিতে পারে না। এমনকি বয়সের ভারে নুয়ে পড়া সত্ত্বেও নফ্স বার্ধ্যক্য স্বীকার করে না। তার চাহিদা ও আকাঙ্খা যৌবনকালের মতই থেকে যায়।

আমাদের একসময় লেপ তোষক ও পর্দার দোকান ছিলো। বহু রকমের ক্রেতাদের আসা যাওয়া হতো দোকানে। একদিন দুই বৃদ্ধা আসলেন দোকানে। একে অপরকে 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করছিলো। বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও খুব উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি করছিলো, 'দেখ, দেখ এটা খুব সুন্দর তাই না?' তাদের গায়েও ছিলো ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যুবতীর মত পোষাক। তাদের এই অবস্থাকে আমরা কী বলে ব্যাখ্যা করবো। তারা কি বিশ্বাস করে দু'দিন পর হায়াত ফুরিয়ে যাবে। এই জগত ছেড়ে যেতে হবে। না। তাদের এই চিন্তা করার ফুরসত নেই। নিজেরাই চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ফলে খুব কাছের মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে না।

যাদের অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ বদ্ধমূল হয়ে যায় তারা বহু কাজে সফলতা লাভ করে। কিন্তু কবরের পাশ দিয়ে আমরা অতিক্রম খুব স্বাভাবিকভাবে; মৃত্যুর কথা মনে আসে না। জানাযা খাট দেখি তবুও মৃত্যুর কথা ভাবি না। অথচ উচিৎ জানাজার খাট দেখে একথা মনে করা যে, হতে পারতো আজ আমি ঐ খাটে শুয়ে থাকতাম।

তিনটি জিনিষ সফলতা ও শান্তির চাবিকাঠি

তাওয়াযু বা বিনয়, যত ধন সম্পদই থাকুক অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মাঝে মাঝে বরং বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা।

ইমাম গাজালী রাহ. সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

"হে পুত্র! সবসময় মনে করবে তুমি মৃত্যুবরণ করেছো আর দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে তোমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। সাবধান দ্বিতীয় সুযোগটিকে তুমি হাতছাড়া করবে না। একটা মূহুর্তও বেহুদা ব্যয় করবে না। জীবনের সময়টাকে সবচে' বড় নেয়ামত করবে।"

মোটকথা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নফসের ধোকা থেকে বাঁচতে পারা ও অমূলক চাহিদাকে দমন করতে পারা।

কাবাবের গন্ধ ও প্রদর্শনী

আলতিনওলুক: মুমিনের জন্য পরীক্ষাগার এই দুনিয়ায় অর্থ সম্পদ তাকে পরীক্ষা করার বড় একটা মাধ্যম। এক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন মুমিনকে সম্পদ আয় ও ব্যয়ের সময় কীসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জীবনে দীন ও দুনিয়ার সীমারেখা কেমন ছিলো?

ওসমান নূরী তপবাস: মদীনায় হিজরত করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। এরপর অমুসলিম ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সুষ্ঠভাবে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নানা প্রকারের চুক্তি সাক্ষর করেন। এসব চুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা নিয়ে আসার পর তিনি হাটে বাজারে বের হতেন। ব্যবসায়ীদের খোঁজ খবর নিতেন। তাদের আয়ের পন্থাগুলো কাছ থেকে অবলোকন করতেন। সে ধারাবাহিকতায় এক গম বিক্রেতার দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হাত দাবিয়ে দিয়ে স্তুপের ভেতরের গমগুলো দেখলেন। দেখলেন, উপরে শুকনো গম থাকলেও ভেতরে ভেজা গম রাখা হয়েছে। দোকানীকে বললেন, ***"এসব কী?"*** লোকটি কাচুমাচু হয়ে বললো, ***"বৃষ্টিতে ভিজে গেছে হে আল্লাহর নবী!"*** লোকটির ওজর পেশ করার মানসিকতা দেখে প্রিয় নবী বললেন, *"যদি বৃষ্টিতেই ভিজে থাকে তবে তোমার কি উচিৎ ছিলো না ভেজাগুলো উপরে রাখা? যাতে ক্রেতারা সহজেই বুঝতে পারে তোমার গম*

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

শপথ সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করলেও বরকত নষ্ট করে দেয়। (বুখারী, বুয়ূ, ২৬)

ভেজা। মনে রেখো, যে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।" (মুসলিম, ঈমান, ১৬৪)

বর্তমান আধুনিক দুনিয়ায় ব্যবসায়ী জীবনে সবচে' বড় ধোকার বিষয় হলো নানা রঙের বিজ্ঞপ্তি। আজকালের প্রচারণার নামে এ্যাডগুলোর মূলে আছে, বেশি বেশি ব্যয় করানো, সম্পদের মানগত দিকটিকে বেশি সুন্দর করে উপস্থাপন করা ও আকর্ষণীয় নারীদের প্রদর্শনী করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা।

আরো একটি দুঃখজনক বিষয় বর্তমানে নজর কাড়ে। সেটি হলো, লৌকিকতাপূর্ণ ব্যয়। কে কার চে' বেশি ব্যয় করতে পারে- এই নিয়েও আজকাল অঘোষিত এক প্রতিযোগীতা চলছে। তাছাড়া বাহারি রকমের খাবার, হোটেলের সামনে সুস্বাদু কাবাব ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে পটেকে অর্থ না থাকা গরীব লোকটি খেতে না পেরে কষ্ট পায়। হতে পারে এটাও বান্দার হক নষ্ট করার মধ্যে শামিল হয়ে পড়বে।

আগের যুগে দোকানপাটের যে অংশে খাবার রাখা হতো সে অংশটি ঢেকে রাখা হতো। যারা ফলফলাদি বা সুস্বাদু খাবার কিনতেন তারাও এমনভাবে ব্যাগে করে খাবারগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরতেন বাহির থেকে দেখার কোনো সুযোগ থাকতো না। ফলে গরীব দুঃখী লোকগুলো এসব খাবার দেখে কষ্ট পেতো না। আসলেও সুষ্ট বিবেকের কথাও এটাই যে, যাকে খাবার দেয়া যাবে না তাকে দেখানো কোনো মানে হতে পারে না।

এজন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের ঘ্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। অথচ সভ্যতার এই যুগে ঘ্রাণ ছড়িয়ে রাস্তার মানুষগুলোকে আকৃষ্ট করা ব্যবসায়ী একটা পলিসি করা হয়। আচ্ছা এসব অমানবিক আচরণের কি কোনো প্রভাব সমাজে পড়ে না? নিশ্চয় পড়ে। এসব করার কারণে গরীব ও ধনীদের মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়। কিন্তু আমরা বেখবর। এতো সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের নজরে পড়ার কথা না।

আল্লাহর নবী গোটা জীবন হক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। এতদসত্ত্বেও জীবনের শেষের দিকে একদিন সমস্ত সাহাবাদের জমা করে তিনি বলেছিলেন, *"হে সাহাবিগণ! অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করে থাকলে সে যেন আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। আমার দেহ তার জন্য খোলা। তেমনি কারো সম্পদে যদি হস্তক্ষেপ করে থাকি সে যেনো ক্ষতিপূরণ নিয়ে যায়।"*

নিজের জীবনে এসব বাস্তবায়ন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শেখাতে চেয়েছেন, "দেখো, বান্দার হকের প্রতি খুব যত্নবান হও। এই দুনিয়াতেই সবার দাবি দাওয়া ছাড়িয়ে নিও। ভুল স্বীকার করতে লজ্জা পাওয়ার কারণে অপরাধকে গোপন করবে না। যার কাছে অপরাধ করেছো তার কাছে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে নাও। আখেরাতের শাস্তি এই ধরণের ভয় ভীতি ও লজ্জা থেকে আরো ভয়াবহ। মোটকথা, যাই করো না আর না করো দান্দার হক নষ্ট করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িও না।" ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে অন্যের হক নষ্ট না করা ও কারো মনে কষ্ট না দেয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ দু'টো বিষয়। এগুলো প্রতিটা ব্যবসায়ীকেই মেনে চলা দরকার।

হাদিসে এসেছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কারো কাছে যদি অন্য কেউ সামান্য অর্থ সম্পদ বা অন্য কিছু পায় সে যেনো মৃত্যু আসার আগেই সে পাওনা বস্ত পরিশোধ করে দেয়। কারণ সেদিন দিনার দেরহাম টাকা পয়সা কোনো কাজে আসবে না। এর বিপরীতে সওয়াবের বিনিময়ে সেদিন সব করা হবে। সে ব্যক্তির নেক আমল থেকে পাওনাদারকে দিয়ে দেয়া হবে; যদি তার নেক আমল থাকে। যদি নিজের ভণ্ডারে নেক আমল না থাকে তবে পাওনাদারের গুনাহ থেকে তাকে ভাগ দেয়া হবে। (বুখারি, মাযালিম, ১০, রিকাক, ৪৮)

শরীয়তের হুকুমগুলো কি শুধু ওলীদের জন্য?

আলতিনওলুক: বহু মানুষের ধারণা হলো শরীয়তের বিশেষ কিছু হুকুম আছে যেগুলো সবার দ্বারা মানা সম্ভব না। বিশেষভাবে সে হুকুমগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর নেককার বান্দাদের জন্য। তাই দীনদারির কোনো উদাহরণ পেশ করতে গেলে তারা বলে, উচ্চতর এমন তাকওয়া অনুযায়ী চলা বুযুর্গ, দুনিয়া বিমুখ আল্লাহর ওলীদের দ্বারাই কেবল সম্ভব। সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে এতো কঠিন হুকুম মেনে চলা অসম্ভব। তাই তাদের জন্য অরো শিথিল পথ অবশ্যই আল্লাহ খুলা রেখেছেন। অথচ আপনি ত বারবার বলে আসছেন শরীয়তের হুকুমগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

ওসমান নূরী তপবাস: আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন।"* (বাকারা, ২৮২) কুরআনে দু'শ আটান্ন স্থানে তাকওয়া শব্দটি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলাহী এই আদেশটির বাস্তবায়ন করা নিশ্চয় প্রতিটি মুমিনের পৃথক পৃথক দায়িত্ব। হতে পারে সবার আত্মা সমান পর্যায়ে পরিশুদ্ধ নয়; কিন্তু মৌলিকভাবে সবাই এই আদেশের সম্বোধক।

আনুগত্য সবসময় মুহাব্বাত অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রকৃত মুহাব্বাত হলো, দু'টি হৃদয়ের মাঝে ঐশী একটা সেতুবন্ধন। সাহাবাগণ সে সেতুর বন্ধনকে প্রিয় নবীর সাথে দৃঢ় করে ছিলেন। তাদের এই সম্পর্ক এতোটাই উন্নীত হয়েছিলো যে, সাধারণ কথাবার্তাতেও তারা প্রিয় নবীকে সম্বোধন করতেন এভাবে, "আমার জান মাল ও মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান!" নিজের সর্বস্ব প্রিয় নবীর জন্য বিলিয়ে দিতে পারাকে তারা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কাজের আদেশ করতেন যত কঠিন কাজই হোক সেটা করার জন্য সমস্ত সাহাবি

এক বাক্যে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি যখন রাজা বাদশাদের নামে চিঠি পাঠাতেন তখন আগেই প্রশ্ন করতেন, এই চিঠি কে বাদশার সামনে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, যে যুগে বাদশার সামনে তার মতের বাইরে কিছু পাঠ করার অর্থ ছিলো জেনে শোনে নিজের জানটা বিলীন করে দেয়া। এতদসত্ত্বেও সাহাবাগণ নির্দ্বিধায় প্রিয় নবীর বার্তা নিয়ে বাদশার দরবারে হাজির হতেন।

"বলে দিন হে নবী! তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পুত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো- এগুলো যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তবে তোমরা আল্লাহ বিধান আসার অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"

নবীর ভালোবাসা দুনিয়ার সবকিছুকে তাদের সামনে তুচ্ছ করে দেখাতো। মক্কাবাসীমুসআব ইবনু উমাইর রাদি. ছিলেন অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী ও সভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তার ব্যবহৃত পোষাকাদী অন্যান্য সভ্রান্তদের জন্য মডেল হিসেবে বিবেচিত হতো। মন যা চায় তাই করার মত পরিবেশ তার সামনে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু ঈমানের ছায়াতলে এসে ওসব কিছুকে উপেক্ষা করলেন। ক্ষণাস্থায়ী দুনিয়ার আরাম আয়েশকে গ্রহন করেন নি। ওমর রাদি. একবার মুসআব রাদি-কে একবার এলামেলো অবস্থায় দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন।

কীসের বিনিময়ে এসব হয়? এমন ভালোবাসার গোপন কথা হলো, তারা প্রিয় নবীকে চেনার মত চিনতে পেরেছিলেন। তাদের সাথে প্রিয় নবীর মন দিল মিলে গিয়েছিলো। আমাদের দূর্দশার একটা কারণ এটাও যে, আমরা আল্লাহর নবীকে প্রকৃত অর্থে চিনতে পারি নাই। তাকে ভালবাসতে জানি নাই।

প্রিয় নবীর ভালোবাসা লাভ হওয়ার জন্য সীরাতের কিতাবগুলো পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। নবীর জীবনী সংক্রান্ত বই অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে করে পড়া দরকার। যে যত বেশি হৃদয়ে মাধুরী দিয়ে প্রিয় নবীর জীবনী পড়বে সে ততো বেশিই উপকৃত হবে। আজ সবাই কষ্টে আছে। ধনী বা গরীব- সমাজের সবাই অশান্তিতে আছে। সাইকোলোজিক রোগে সবাই আক্রান্ত। সাহাবাদের জীবনে এমন পাওয়া যায় না। একজন সাহাবিও কি প্রিয় নবীর কাছে এসে কোনোদিন বলেছেন যে, আমার মনে শান্তি নাই?

আজকের সমাজে যে যত ধনী সে ততোই পীড়াদায়ক অবস্থায় আছে। আগের তুলনায় ধনী হচ্ছে লোকজন; কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না। পারিবারিক বিচ্ছেদ কি আগের থেকে কম না বেশি? সন্তানরা আগের চে' অবাধ্য নয়? শিশুদেরকে কুরআন হাদিস প্রিয় নবীর ভালোবাসা না শিখিয়ে ভুল ঠিকানায় শান্তি খোঁজা হচ্ছে। কী করে পাবে শান্তি!

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন জিহালিয়্যাতের মানুষগুলোকে পরিশুদ্ধ করে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন তেমনি আজও মানবতার মুক্তির জন্য তাঁর রেখে যাওয়া উত্তম আদর্শের প্রয়োজন।

তাই শান্তি পেতে আমাদেরকে প্রিয় নবীর শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে। ভুল পথে অন্তরের বন্ধন গড়ে তুললে রাস্তার পাশে গজানো ফুল গাছের মত মানুষের পায়ে দলিত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। মোটকথা সাহাবাদের মত প্রিয় নবীকে ভালোবাসতে শেখা আমাদের জন্য জরুরী। মাঝে মাঝে একাকী বসে প্রিয় নবীর ভালোবাসা ধ্যান করা উচিৎ। যেমন আবু বকর রাদি. করতেন।

আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির যোগানদাতা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সীমাহীন আখেরাতের জীবনের রাহবার তিনি। আমাদের কত সৌভাগ্য শেষ নবীর উম্মত আমরা। একজন বৌদ্ধ যদি পুরো দুনিয়ার মালিকও হয়ে যায় আমাদের এই নিয়ামতের সামনে

সেসবের কী মূল্য আছে! জাগতিক কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা কী পরিমাণ হাহুতাশ করি? আবারো সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য কত না চেষ্টা সাধনা করি। কিন্তু আমরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো কিছু হাতছাড়া করলে সে পরিমাণ পেরেশানী করি না। অথচ জাগতিক বিষয় থেকেও ধর্মীয় বিষয়গুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তাই একান্ত গোপনে একাকী প্রত্যেকেই নিজেকে প্রশ্ন করা উচিৎ, "দুনিয়া আখেরাতের তুলনামূলক কী পরিমাণ চিন্তা আমাদের মাঝে আছে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ে থেকে বিদায়ের বিষয়ে কী পরিমাণ ভাবি? কেয়ামতের দিন আল্লাহর রোষানলে পড়ে কতটুকু ভয় আমাদের মাঝে কাজ করে?"

সাহাবাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা থেকে বেশি অন্যকিছুর ভালোবাসা ছিলো না। ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেমি ভালোবাসতেন। কেননা ওসব বস্তু দুনিয়াতে পড়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালো অনন্তকাল সুখের কারণ হবে।

যদি এসব চিন্তা আমাদেরকে নাড়া না দেয় বুঝতে হবে হৃদয়ে গাফলতি চড়াও হয়েছে। এর চিকিৎসা হলো, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **"হৃদয়গুলো কেবলমাত্র আল্লাহর যিকিরের দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করে।"** (রা'দ, ২৮) যিকিরটাও যেনো শুধুমাত্র আমাদের ঠোঁট দিয়ে না হয়; বরং অন্তরের আবেগ দিয়ে আল্লাহকে ডাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

মুমিনের মন সব সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বেপরোয়া থাকবে। সে সার্বক্ষণিক আল্লাহর পর্যবেক্ষণের মাঝেই আছে এ কথা সে ভুলে যাবে না। সিসি ক্যামেরা থাকলে দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম মানতে গিয়ে আমাদের চলাফেরা কতটা সতর্ক হয়ে যায়। ভুল কোনো আচরণে আবার ধরে পড়ে যাই কী না সে ভয়ে কম্পিত থাকি। তেমনি আল্লাহর ফেরেস্তারাও যে আমাদের উঠাবসা থেকে শুরু করে সবকিছু রেকর্ড

করছে, ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলে রাখছে এই চিন্তা কী আমাদের আছে? যখন সময় আসবে অডিও ভিডিও সব রেকর্ড সামনে তুলে ধরে আল্লাহ বলবেন, **"নাও তোমার আমলনামার রেকর্ড। পড়ো। নিজের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য তুমিই যথেষ্ট।"** (ইসরা, ১৪)

"হে আল্লাহ! তোমাকে যে পেয়েছে সে কি হারিয়েছে? আর তোমাকে যে পেয়েছে সে কীইবা হারিয়েছে?" (হিকামে আতাইয়্যাহ)

মূল সমস্যা আত্যশুদ্ধির অভাব

আলতিনওলুক: মুসলমানদের এই দুনিয়ায় সবচে' বড় পরীক্ষা হলো সম্পদ। অর্থ সম্পদ যদি তাকওয়া কেড়ে নেয় তবে কি মুসলমানরা সম্পদ জমা করা থেকে বিরত থাকবে?

ওসমান নূরী তপবাস: সম্পদ একটা চাকুর মত। ধারালো ধারহীন দু'টো মাথাই আছে। তেমনি সম্পদেরও দু'টি দিক আছে। সম্পদের কারণে তাকওয়া হারা হয় আবার সম্পদই কারো কারো তাকওয়ার মাধ্যম হতে পারে। অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী এই ভিন্নতা হয়। মূল সমস্যা অন্তরে। যে অন্তরে সম্পদের মুহাব্বাত আছে সেটি বিপদগ্রস্ত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বারাবার আত্মার পরিশুদ্ধির গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন, "যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাজির হবে সে মুক্তি পাবে।"

আবু হাযিম রাহ. প্রসিদ্ধ একজন পূর্বসূরী আলেম। তিনি বলেন,

"যে ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি করে দেয় না তা বাহ্যিকভাবে যতই ভালো দেখা যাক না কেনো মূলত সেগুলো আমাদের মহা বিপদের কারণ।"

আলতিনওলুক: আপনার মত তাহলে সম্পদের অধিক্যতা মুসলমানের জন্য ক্ষতিকারক নয়। ক্ষতির দিক হলো, আত্মার পরিশুদ্ধি না করে সম্পদ অর্জন করা।

ওসমান নূরী তপবাস: জী অবশ্যই। আমিও ঠিক এমনটিই বুঝাতে চেয়েছি। আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে, 'হুজুর মেয়েটি এমন হয়েছে, ছেলেটি এই করেছে, তাদের কী করে মানুষ করবো?'আমরা কী উত্তর দেবো! বলি জীবনে তাদেরকে যা দিয়েছেন বড় হওয়ার পর তাদের থেকে অক্ষরে অক্ষরে তাই পাবেন।

আমার উস্তাদ মরহুম আলী উলভী রাহ.-এর একটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সংখ্যায় অনেক কম লোক হজ্জে যেতো। লোকজন কম হওয়াতে হাজিদের মাঝে ভালই সখ্যতা গড়ে উঠতো। মরহুম উস্তাদ একদিন আরাফার পাশে একটা লাইব্রেরীতে আফ্রিকায় এক আমীরের সাথে বসে খেশগল্প করছিলেন। এমন সময় মক্কায় হজ্জের এক দায়িত্বশীল এসে আফ্রিকার লোক আদাব আখলাক ও মসজিদের প্রতি সম্মান করে না বলে অভিযোগ করলো। আফ্রিকার আমীর উত্তর দিলেন, "আপনার আফ্রিকানদের কী দিয়েছেন যে ভাল কিছুর অপেক্ষায় আছেন? রাসূলের সাহাবিরা আফ্রিকানদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ফলে তারা আজ মুসলমান। আপনারা কি এই পর্যন্ত কোনোদিন আফ্রিকায় গিয়েছেন? এখানে এসে প্রথমে তারা পরিপাটি মসজিদ দেখেছে। এর আগে ধূলোবালির উপর এরা নামায পড়েছে। ত মসজিদের আদাব শেখাতে কি আপনারা আফ্রিকায় গিয়েছেন যে, আজ তাদের থেকে মসজিদের আদাব পালনের অপেক্ষা করছেন?" হজ্জের দায়িত্বশীল একেবারে চুপ মেরে গেলেন। একটা কথাও না বলে মজলিশ থেকে সরে পড়লেন।

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় জগত ছিলো, অতি উত্তম সুগন্ধিযুক্ত জান্নাতের ফুলের বাগানের মতো। আমরা জন্নাতের সে বাগান থেকে নিজেদের জন্য কতটুকু নিতে পারলাম? আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়ীক জীবন তাঁর সাথে কতটুকু মিলে?"

আজও আমাদের এটাই সমস্যা। মা বাবা এমন কী দেয় তাদের সন্তানদের যে ভাল কিছুর অপেক্ষা করে! ইসলামকে নতুন করে আমাদের জানা দরকার, জানানো দরকার। ইসলামের সৌন্দর্যগুলো ফুটিয়ে তোলার মত যোগ্য লোকের মুহতাজ আমরা।

মাওলানা রুমী কত সুন্দর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এই বিষয়ে:

"এক রাতে বাইরে বের হলাম। বাড়ির সামনের ক্ষেতে পায়চারী করছিলাম। দেখলাম, কুপি বাতি হাত একটা লোক কী যেনো খোঁজছে, জিজ্ঞেস করলাম, কী তালাশ করছো? বললো, মানুষ খোঁজি, মানুষের মত মানুষ। আমি বললাম, হাল ছেড়ে দেও। মানুষ খোঁজে লাভ নাই; পাবে না, যাও শুয়ে পড়ো। আমি নিজেই বহু তালাশ করেছি। মানুষ না পেয়ে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। লোকটি আমার দিকে খুব করুণার দৃষ্টিতে তাকালো এবং বললো, তুমি হতাশ হয়ে পড়লেও আমি মানুষের মত মানুষ খুঁজতেই থাকবো। এতেই আমি শান্তি পাই।"

আজও সমাজ প্রকৃত মানুষের দিকে মুখাপেক্ষী।

শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক

আলতিনওলুক: হযরত গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে কথা বলেছেন। অর্থনৈতিক একটা অঙ্গন হলো, কল কারখানা। তাই মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে- এই বিষয়েও যদি কিছু বলতেন।

ওসমান নূরী তপবাস: আমরা ত গরীব লোকদের জন্য ব্যথিত হই। তাদের অবস্থা দেখে কষ্ট পাই। মূল ঐ সকল মালিকদের জন্যই আফসোস করা দরকার যারা অধীনস্তদের উপর জুলুম করে। মালিক শ্রেণীদের প্রতি আমাদের যত্নবান হওয়া উচিৎ। এদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে মেহনত করা দরকার। কারণ বর্তমানের অধিকাংশ সমস্যা তাদের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। এসব লোকদের যদি সঠিক পথে আনা যায় সমাজের অনেক সমস্যা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। আগেও উল্লেখ করেছি, মালিকরা আজকাল শ্রমিকদের উপর এই বলে গর্ব করে যে, তাদের কারণেই শ্রমিক দু' এক পয়সা রোজগার করার সুযোগ পাচ্ছে। অথচ এমন কথা বলার তার কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমিককে কয় টাকা দেয় যে, তার এত বড় বলার অধিকার থাকবে!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের আগে যখন কষ্ট বলতে কষ্ট হচ্ছিলো তখনো তিনি ক্ষীণ আওয়াজে দু'টো কথা বার বার বলছিলেন। একটি হলো, নামায নামায নামায। আরেকটি হলো, তোমরা অধীনস্ত শ্রমীক চাকরদের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করবে।

মুসলিম মালিকদের উচিৎ অধীনস্ত শ্রমীকদের নিজেদের খাবার থেকে খাবার দেয়া। তারা যা পরিধান করবে সেই মানের কাপড়ই শ্রমীকদের পরিধান করাবে। সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না। এই রহমত ইসলাম মানুষেরই উপর নয় শুধু; প্রাণীদের

উপরও করেছে। একবার রাসূল সা. একদল লোককে পশুর উপর চড়ে অহেতুক গল্প গুজব করতে দেখেন। এটা দেখে তিনি বললেন,

"বাহনগুলোতে তোমরা আরোহণ করো। কিন্তু তাদের কষ্ট দিও না। সময়মত আরাম করতে দিও। পথে ঘাটে গল্প গুজবের জন্য বাহনে চড়ে বসে থাকবে না। বহু বাহন আরোহনকারী থেকেও উত্তম। তারা আরোহনকারীর চেয়েও বেশি আল্লাহর যিকির করে থাকে।" (আহমাদ, ৩য়, ৪৩৯)

আলতিনওলুক: তার মানে কি মুসলমান হিসেবে একজন মালিক অন্যদের তুলনায় শ্রমীকদের প্রতি আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ?

ওসমান নূরী তপবাস: হুজুরাত সূরাতে আছে, **"তোমাদের মাঝে সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি হলো যে তোমাদের মাঝে অধিক আল্লাহভীরু।"** (আয়াত, ১৩) আয়াতটি একটি গোলাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আমাদের জানা আছে, ঐ যুগে যুদ্ধ বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হতো। একটা গোলাম মুসলমান হওয়ার পর তাকে যখন বিক্রি করার জন্য বাজারে নেয়া হলো, তখন সে মালিকের কাছে একটা শর্ত করলো। সে বললো, আমি সব আদেশ মেনে নিবো তবে আমাকে রাসূলের পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার সুযোগ দিতে হবে। তার এই শর্ত মেনে তাকে বিক্রি করা হলো।

গোলাপকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তুলানা দিলে এই জীবনের সবচে' বড় অর্জন হলো,

সমস্ত গোলাপের শোভা সে নবীকে চিনতে পারা,

সে পবিত্র গোলাপের ঘ্রাণ ও সংস্রব লাভ করতে পারা,

সে গোলাপের পাপড়ি হতে পারা।

গোলামটি নামাযে আসে কী না স্বয়ং রাসূল খোঁজ রাখতেন। একদিন তাকে না দেখে মালিককে গোলামের খবর জিজ্ঞেস করলেন। মালিক গোলামটির অসুস্থ হওয়ার সংবাদ দিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কৃপণ স্বর্ণকার নিজের জন্য নতুন থলি সেলাই করে
কবরেও চলে এমন রৌপ্য সংগ্রহে নিজেকে ব্যস্ত রাখে
(নাযিব ফাযিল কিসা ইউরেক)

সাহাবাদের নিয়ে তাকে দেখতে চলে গেলেন। কিছুদিন পর আবারো তাকে নামাযে দেখতে না পেয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন সে অসুস্থ তিনি এবারও সাহাবাদের নিয়ে গোলামের শিউরে হাজির হলেন। গোলামটির অবস্থা নাজুক দেখে তিনি তার পাশেই থ াকলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিলেন। মৃত্যুর পরও কাফন দাফন ও জানাযার ব্যবস্থ করলেন। এ দেখে মুহাজির সাহাবাগণ বললেন,

"আমরা ঈমানের টানে নিজ বাড়ি ঘর ত্যাগ করে এসেছি। জান মাল সব কিছু ইসলামের জন্য বিলীন করে দিয়েছি। অথচ রাসূল সা. দেখছি এই গোলামকে আমাদের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।" মদীনাবাসী আনসারগণও এই ধরণের কিছু মন্তব্য করলেন। এই প্রেক্ষীতেই আয়াতটি নাযিল হয়, "তোমাদের মাঝে সবচে' সম্মানিত হলো, যে সবচে' মুত্তাকী।"

পুঁজিবাদী সমাজে ইসলামী জীবন যাপন

আলতিনওলুক: আরো একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত সমাজথেকে ইসলাম মানা সম্ভব কী না? যদি সম্ভব হবে তবে কী ধরণের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ? এবং সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের দায়িত্ব কী?

ওসমান নূরী তপবাস: পুঁজিবাদে বিশ্বাসী সমাজে ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হলেও অনেক কঠিন একটা বিষয়। ইসলাম আগমনের যুগে অর্থ্যাৎ জাহেলী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পুঁজিবাদ থেকে খুব একটা ভালো ছিল না। সুদ ঘুষ ও জুয়া সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিলো। ইসলাম এমন অন্ধকার সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী সমাজের এমন অন্যায় নিয়ম নীতির মধ্য দিয়েও সঠিক ব্যবসায় নিজেকে মশগুল করেছেন। এসব করে তিনি ইসলামের সঠিক পদ্ধতিটা সমাজের লোকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং অল্প কয়দিনের ব্যবধানে সুদ ঘুষকে সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছিলেন।

হাদিস শরীফে আছে,

"আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের দুর্বলদের দু'আ, নামায ও ইখলাসের বদৌলতে পুরো উম্মতকে সাহায্য করেন।" (নাসাঈ, জিহাদ, ৪৩)

এছাড়াও মুসলমানরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অধীনে বসবাস করেছেন। একজন খাঁটি মুসলমান ঠিক স্বর্ণের মত। কাদা মাটিতে পড়ে গেলেও নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় না। তেমন একজন মুসলমান যেকোনো তন্ত্রমন্ত্রের বেড়াজালেই আবদ্ধ হোক না কেন নিজের অস্তিত্বকে সে হারায় না। কারণ সে সমাজের রীতিনীতির আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নজরে রাখে। আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি

মুসলমানদের একনিষ্ঠতা সবযুগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের হিদায়েতের উসীলা হয়েছে।

ব্যবসায়ী জীবনে হারামে না জড়িয়ে হালাল পন্থায় উপার্জনের বরকতকে আমার পিতা মরহুম মুসা আফেন্দী রাহ. নীচের ঘটনার মাধ্যমে বুঝাতেন-

আমাদের একজন অমুসলিম প্রতিবেশী ছিলো। একসময় সে ইসলাম গ্রহন করে। তাকে ইসলাম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতো, "আমার মুসলমান হওয়ার কারণ হলো, পাশের বাড়ির মোল্লা রাবি'। মোল্লা রাবি' খামার পরিচালনা করতেন। দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন মাগরীবের সময় আমাদের দরজার সামনে এসে হাজির হয়। দুধের একটি পেয়ালা দিয়ে বলে, নিন এই দুধ আপনাদের। আমরা অবাক হই। তিনি বললেন, আমার অজান্তে একটা গাভি আপনাদের ক্ষেতে ঘাষ খায়। সে ঘাষ থেকে উৎপাতিদ দুধ আপনাদের। এই বলে তিনি আমাদেরকে দুধ দিয়ে যান। এবং আরো কিছুদিন এর বিনিময় হিসেবে দুধ দিতে থাকেন। তার এই আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাবলাম যে ধর্ম অন্যের অধিকারের বিষয়ে এতটা গুরুত্ব সেটাই হবে সঠিক ধর্ম। তাই মুসলমান হয়ে গেলাম।"

মুসলমানদের আচরণ অন্যের জন্য মডেল। একজন মুসলমানকে দেখেই অন্যরা ইসলামের বিষয়ে জানতে পারে। আমাদেরও অজান্তে বহু মানুষ আমাদের দেখে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা নেয়। ছোট্ট একটা আচরণও অনেক সময় তাবলীগের কাজে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। এরকম একটা উদাহরণ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রবেশের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রবেশ

ইন্দোনেশিয়ায় কীভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিলো? ইসলাম মানা একজন মুসলমান কাপড়ের ব্যবসা করতো। একবার সে জাহাজে করে কাপড় নিয়ে সাগর পথে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবসার জন্য থামে। বাজারের অবস্থা ভালো দেখে সেখানেই স্থায়ী ব্যবসার নিয়ত করে। তার আনিত কাপড়গুলো বাজারে বেশ সুনাম কামায়। লোকেরা যেনো এতোদিন এই কাপড়ের অপেক্ষাই করছিলো। তার দোকানে খুব ভিড় থাকে সবসময়।

মুসলিম ব্যবসায়ী ছিলো সাংঘাতিক অল্পতুষ্ট। ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, "কপালে রাখলে এমনিতেই সম্পদ উপার্জনের সুযোগ হবে। কিন্তু আমার উচিৎ যাই পকেটে আসে সেটা হালাল কী না যাচাই করা।" এজন্য সে কাপড়ের জনপ্রিয়তাকে সুযোগ মনে করে ন্যায্য দাম থেকে বাড়িয়ে কোনোদিন কাপড় বিক্রি করে নি। অল্পদিনে ধনী হয়ে যাওয়ার স্বপ্নও তার মাঝে ছিলো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

পণ্য বাজারে উঠিয়ে আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত কোনো বান্দা যদি অসৎপথ অবলম্বন করে তবে সে ল্গ্নতপ্রাপ্ত হবে।

(ইবনু মাজাহ, তিজারাত, ৬)

ক্রেতাদের ভিড়ের কারণে একা দোকান শামাল দিতে পারতো না সে ব্যবসায়ী। তাই একজনকে পারিশ্রমিক দিয়ে দোকানে রাখলো। একদিন মুসলিম মালিক বিলম্ব করে দোকানে আসে। দেখে অন্যদিনের তুলনায় ক্যাশে অনেক বেশি টাকা। কর্মচারিকে জিজ্ঞেস করলো, "এতো টাকা কী করে আসলো ক্যাশে? কোন কোন কাপড় এই পর্যন্ত বিক্রি করেছো?" কর্মচারি কাপড়ের থান দেখিয়ে দিলে কত করে বিক্রি করেছে জানতে চাইলো মালিক। সে উত্তর দিলো দশ করে।

মুসলিম মালিক খুব রাগ করলেন। একি করলে তুমি। পাঁচ টাকার জিনিষ দশ টাকা করে বিক্রি করেছো। ক্রেতাদের হক অন্যায়ভাবে তুমি আমার ক্যাশে ঢুকিয়েছো। এখন কি তুমি ক্রেতাদের দেখলে চিনবে? সে হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলো। মালিক বললো, তবে দেরী না করে জলদী তাদের নিয়ে আসো। সময় ব্যয় না হওয়ার আগেই তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিবো। কর্মচারি তালাশ করে ক্রেতাদের হাজির করে। দোকানের মালিক তাদের সামনে করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদেরকে পাঁচ টাকা ফেরত দেয়। ক্রেতারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। কারণ এমন আচরণ তারা কোনোদিন দেখে নি। অবশেষে অতিরিক্তি টাকা নিয়ে ক্রেতারা বাড়ি ফিরে। কিন্তু লোক মুখে এই ঘটনা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। এক সময় এই সংবাদ তৎকালীন রাজার কাছে যায়। রাজা মুসলিম ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠান।

রাজার প্রথম প্রশ্ন ছিলো, তুমি করেছো এমন দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই। কিন্তু কেন তুমি এমনটি করলে? মুসলিম ব্যবসায়ী উত্তর দিলো, মুসলমান হিসেবে অন্যায়ভাবে সম্পদ উপার্জন করা আমার জন্য বৈধ নয়। লভ্যাংশেরও একটা সীমা আছে আমার ধর্মে। তা থেকে বেশি হওয়ার কারণে সে টাকাটা ধোকার আওতায় পড়ে। এবং সেটা আমার জন্য হালাল ছিলো না। তাই আমি ক্রেতাদের ডেকে এনে ফেরত দেই। আমি তেমন কিছু করি নি; আমি ত কেবল আমার একটা ভুলের সংশোধনী করেছি মাত্র।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নামাযে যদি অনেক বেশি মনোযোগী হও এবং রোজা রাখতে খুব আগ্রাহী হও তবে আগে আয় রোজগারে সতর্কতা অবলম্বন করো। কারণ যার লুকমা হালাল নয় তার এসব আমলও কবুল হয় না।

ব্যবসায়ীর এই কথা শুনে রাজা ইসলাম সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলো। এবং ব্যবসায়ীও সাধ্যমত উত্তর দিতে থাকলো। একসময় রাজাহ

ইসলামে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। তার সাথে আশপাশের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এটাই হলো বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যায় সবচে' বড় দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রবেশের ইতিহাস। একজন খাঁটি মুসলিম ব্যবসায়ীর সৎ আচরণের বদৌলতে সেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটেছিলো। (মুহাম্মাদ পাকসু, ইসলাম হায়াতা গেলিঞ্জে)

এটাই ইসলামের শিক্ষা। একজন মুসলিম যেখানে যাবে তার কথা, আচরণ ও চলাফেরা থেকেই সে ইসলামের দিকে অন্যকে আকৃষ্ট করবে।

ব্যবসায়ীদের বিপ্লব প্রয়োজন

কিতাবের শেষ দিকে আমরা এই কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ক্ষীণ হয়ে আসা, সামাজিক শান্তি নিরাপত্তা কমে আসা ও দ্বন্দ্ব কলহযুক্ত আমাদের সমাজটাতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ীদেরকে নতুন এক বিপ্লবের ডাক দেয়া উচিৎ। চারিত্রিক কোনো অবক্ষয়ের আশ্রয় তারা ব্যবসার ক্ষেত্রে দেবে না- এটাই হবে তাদের বিপ্লবের প্রধান ধারা।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে কারো ব্যাপারে প্রশংসা করা হচ্ছিলো। উমর রাদি. প্রশংসাকারীকে বললেন,

প্রশংশিত সে ব্যক্তির সাথে তুমি কি বসবাস করেছো? বা তার সাথে লেনদেন করেছো কোনো দিন? কিংবা তুমি কি তার সাথে সফরে বেরিয়েছো?

মনে হচ্ছে তুমি তাকে মসজিদে হেলে দুলে খুব মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়তে দেখেছো। আর এতেই তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছো। প্রশংসাকারী হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন। এবার উমর রাদি. বললেন,

আমি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো না দেখে তার প্রশংসা করতে যেও না। কারণ বান্দার ইখলাস মসজিদে বসে কুরআন পড়া থেকে বুঝে আসে না। সেজন্য দরকার তার সাথে মুয়ামালাত ও মুয়াশারাতে লিপ্ত হওয়া।

সমাজের আর দশটা মানুষ যখন ধন সম্পদের দাস বনে বসে আছে তখন খাঁটি কিছু মানুষের খুব দরকার যারা ইতিহাসের অন্য যেকোনো যুগের তুলনায় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে বেশি শক্তিশালী হবে এবং আল্লাহর সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

আলতিনওলুক: সময়ে সময়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য শুকরিয়া। আশা করি এসব প্রশ্ন উত্তর সবার জন্য উপকারী হবে।

ওসমান নূরী তপবাস: আপনার প্রতি আল্লাহ রাজি ও খুশি হোন। শেষমেশ আমাদের পত্রিকাটির বিষয়ে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। প্রকৃতপক্ষেই আলতিনওলুক আজ তুরস্কে পঞ্চাশ হাজার মানুষের জনপ্রিয় একটি মাসিক পত্রিকা। যে পত্রিকার পাঠক যত বেশি সেটি বাহ্যিকভাবে ততই সফল। কারণ পত্রিকার লেখাগুলো একান্তই যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। তাই সাধারণ একজন পাঠক যদি একটা পাতাও পড়ে তাই তার লাভ। তাছাড়া অজানা কত পাঠকের কাছে যে আলতিনওলুক পৌঁছে যায় সে খবর হয়তো আমাদেরও নাই। হতে আমাদেরও অজান্তে বহু মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান দেয় এই আলতিনওলুক।

> প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেন,
>
> তোমাদের পূর্বে এই জগতে বাস করেছে এমন এক বান্দার সাথে আল্লাহ রহম করেছিলেন। কারণ সে বান্দা নিজের পণ্য বিক্রি করার সময়, কারো থেকে কিছু ক্রয় করার সময় এবং ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে সহজতা অবলম্বন করতো। এসব ক্ষেত্রে কঠোরতা করতো না সে।
>
> (তিরমিযি, বুয়ূ, ৭৫/১৩২০)

তুরস্কের আনাচে কানাচে এই পত্রিকা পৌঁছে যায়। নারী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত মোটকথা সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে শুরু সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো স্তরেই এই পত্রিকা পৌঁছার বাকি থাকে না। আল্লাহ তা'আলা ছাব্বিশ বছর ধরে এই পত্রিকাটি প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছেন। আমাদের ও আপনাদের পরও এই পত্রিকার প্রকাশ যেনো বাকি থাকে। একে যেনো আল্লাহ আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমাদের জন্য একে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

বিনামূল্যে

ইসলামি কিতাবের

পিডিএফ দুনিয়া

৫৫টি ভাষায় দেড় হাজারেরও বেশি ইসলমি কিতাব ফ্রীতে ডাউনলোড করতে পারেন

পৃথিবীর অনেক ভাষায় আমাদের ইসলামি কিতাবগুলো
www.islamicpublishing.org ইন্টারনেট সাইডে পাঠকের অপেক্ষায়।

এরকাম প্রকাশনী | islamicpublishing.org |